ক্যান্সারের সাথে বসবাস

জাহানারা ইমাম

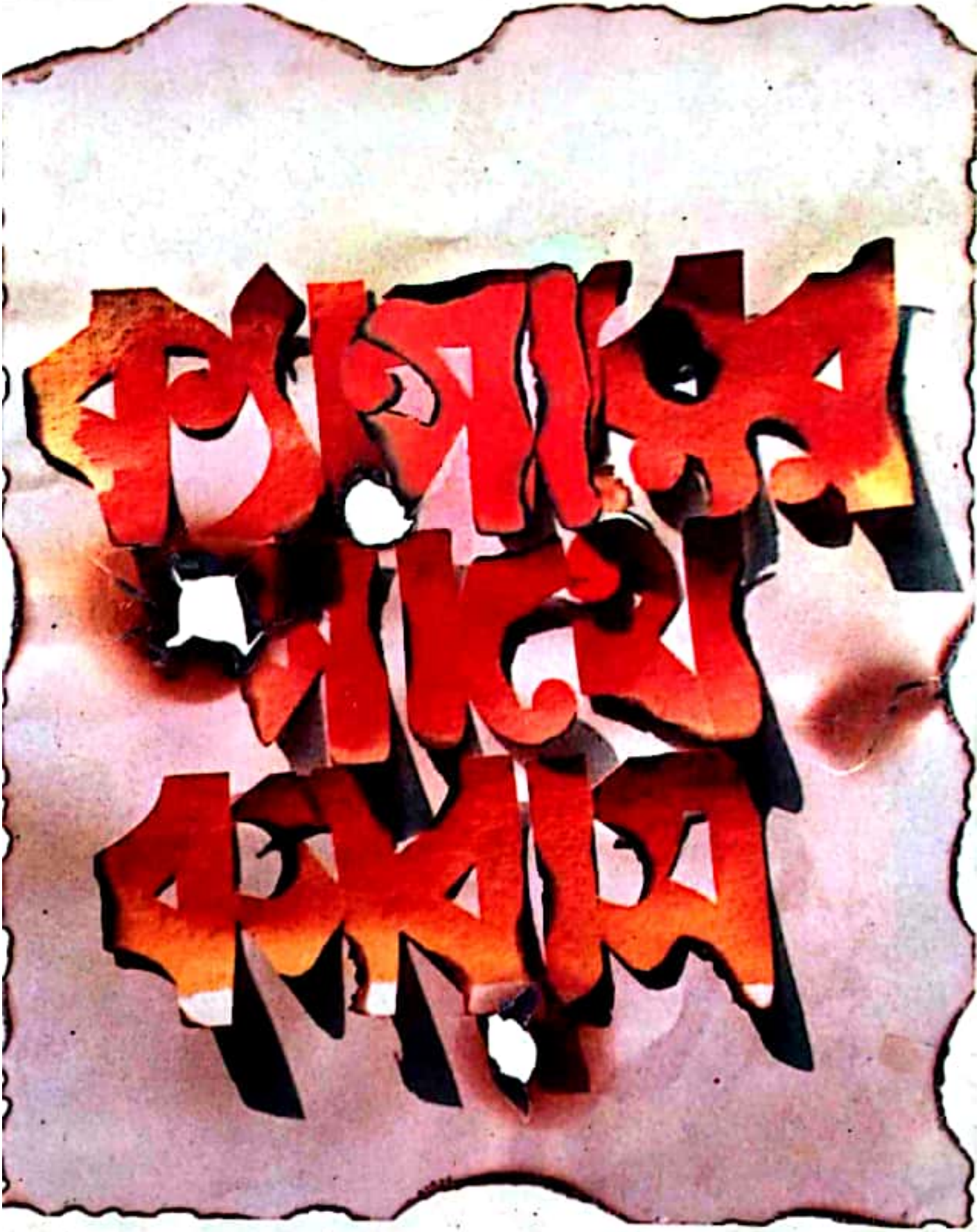

স্বত্ব : সাইফ ইমাম (জামী)

প্রকাশক মোঃ আফসারুল হুদা
আফসার ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলা বাজার (দোতালা)
ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১
তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৩
প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল
প্রথম প্রচ্ছদের আলোকচিত্র
পাভেল রহমান
শেষ প্রচ্ছদে লেখিকার আলোকচিত্র
শাকুর মজিদ

মূল্য পঁয়তাল্লিশ টাকা

পরিবেশক :
বিতরণী
১৫৫ আন্দরকিল্লা , চট্টগ্রাম
কম্পিউটার কম্পোজে
ডেস্কটপ কম্পিউটিং লিঃ
১৩৮, শান্তিনগর, ঢাকা – ১২১৭
ফোন : ৪০৯৭১০

উৎসর্গ

আমার মতো বেদনার্ত ক্ষত - বিক্ষত
ভুক্তভোগীদের উদ্দেশে

দাঁত নিয়ে আমার ছোটবেলা থেকেই ঝঞ্ঝাট। প্রায় প্রায় দাঁতে ব্যথা হ'ত, মা বলতেন, দাঁতে পোকা লেগেছে। তারপরই বকুনি লাগাতেন, 'এত করে বলি চকলেট লেবেঞ্চুস খাবিনা অত বেশি, রাতে দাঁত মেজে শুবি; তা কে কার কথা শোনে। এখন মর দাঁতের ব্যাথায়।' মা বকতেন বটে তবে তার পরপরই দাঁতের যন্ত্রনা উপশমের জন্য ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। শহরে মাঝে মাঝে দাঁতের পোকা ঝাড়ানোর ওঝা আসত। এখন তো জানি, দাঁতের পোকা বলে কিছু নেই, অসুখটা হ'ল দাঁতের ক্যারিজ। কিন্তু সেই কালে পোকাঝাড়া লোকটি কি এক শেকড় গালে বুলিয়ে দাঁতের ভেতর থেকে সত্যি সত্যি পোকা বের ক'রে আনত। ওরা কানের ভেতর থেকেও পোকা এবং ময়লা বের ক'রত ঐসব জড়ি-বুটি ছুঁইয়ে। আব্বা এসব বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, 'সব বুজরুকি। পয়সা কামাইয়ের ফন্দি। ওরা আগে থেকেই হাতের তালুতে পোকা লুকিয়ে রেখে হাত সাফাই করে দেখায় যে ওগুলো দাঁত বা কান থেকে বের করেছে।' আসলে কান পাকলেও কম যন্ত্রনা হ'ত না। আর ছোটবেলায় কে না কান-পাকাতে ভুগেছে। তাই ওরা যখন জড়ি-বুটি ছুঁইয়ে এসব করত সহজ বিশ্বাসে অনেক সময় ব্যথা আরাম হয়ে যেত।

ছোট বেলায় মিষ্টি জিনিস একটু বেশিই খেতাম। চকলেট, লজেন্স - - - না পেলে ফিরনী পায়েস, সেটাও না থাকলে মুঠো মুঠো চিনি। গুড় ও বাদ যেত না। খেজুড় গুড়ের পাটালি! আহা । চকলেটের মতো চুষে চুষে খেতে কি মজা। তা, এই মিষ্টি খাওয়ার শাস্তিও বড় কম পাই নি। দাঁতের ক্যারিজ এত বেশি হ'য়েছিল যে অনেক দাঁতের গোড়া এবং কোন কোন দাঁতের আগা ক্ষয়ে গিয়েছিল, চোয়ালের মোটা মোটা দাঁতের মধ্যিখানেও ক্ষয়ে ছিদ্র হ'য়ে গিয়েছিল। খুব ব্যথা হ'লে মা সামান্য এক চিলতে তুলো আয়োডিনে ভিজিয়ে দাঁতের মধ্যিখানে ঢুকিয়ে দিয়ে বলতেন, চেপে থাক। এতে সাময়িক উপশম হ'ত। কিন্তু সেকালে দাঁতের ক্যারিজ সম্বন্ধে আজকের মতো এত স্বাস্থ্য-সচেতনতা ছিলনা। একটু বড় হ'তে যখন চোয়ালের দাঁতগুলো পড়ে গেল, তখন খুব আরাম পেলাম। আবার সব নতুন দাঁত উঠল। আগে তো ক্যারিজের জন্য বাঁ পাশের চোয়ালের দাঁতে চিবোতেই পারতাম না, শুধু ডানদিকের দাঁতে চিবোতাম। নতুন দাঁত ওঠার পর - - - আহ্ সে কি আরাম। এখন দুই দিকেই চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারছি।

কিন্তু এ আরামও বেশি দিন ভোগ করতে পারলাম না। যখন বয়স ২৬/২৭, দুই ছেলের মা হ'য়ে গেছি, সেই সময় হঠাৎ আবার চোয়ালের মাড়িতে ভীষণ যন্ত্রনা। গাল ফুলে গেল, কিছু খেতে পারিনা। কট্‌কট্ ব্যাথার চোটে ও চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির।

ডাক্তার দেখে এবং এক্স-রে করিয়ে পরে বললেন, ওপর নিচ দুপাশে দুটো করে আক্কেল দাঁত ওঠেনি, ওঠার জায়গাও নেই মাড়িতে অথচ ওঠার জন্য গুঁতোগুঁতি করছে। তাই এত ব্যথা।

সেকি ? এখনো আক্কেল দাঁত ওঠেনি। ও নাকি ১৭/১৮ বছরেই ওঠে, আমার তো এখন ২৬/২৭—

স্বামী মুখ টিপে হেসে আস্তে করে বলল, 'এখনো আক্কেল হয়নি।'

আমি রেগে কাঁই হ'লেও করবার কিছু ছিলনা। ডাক্তার বললেন, 'ওষুধ দিচ্ছি। আগে ফোলা আর ব্যথা কমুক। তারপর মাড়ির ওপর দিক চিরে দেব। তাহলে দাঁত উঠেও যেতে পারে।'

কিন্তু আক্কেল দাঁত উঠতে পারেনি। কারণ জায়গা তো নেই। কেন নেই? মনুষ্য দেহ যিনি তৈরী করেন তিনি তো সর্ব অঙ্গ মাপ মতোই করেন। তাহলে আমার বেলায় এই ব্যত্যয় কেন? কেন মাড়িতে জায়গা নেই, অথচ ভেতরে আক্কেল দাঁত রয়েছে?

ফোলা ও ব্যথা কমার পর মাড়ির ওপরদিকটা একটু খানি চিরে দিয়েও শেষ পর্যন্ত দাঁত মাথাচাড়া দিতে পারেনি। বছরদুয়েক প্রায় প্রায়ই ব্যাথা হ'ল তারপর ডাক্তার একদিন বললেন, 'দাঁতগুলো তুলে ফেলতে হবে। নইলে চিরকালই ওরা এইরকম গুঁতোগুঁতি করবে আর আপনি কয়েকমাস পর পর ব্যথায় ভুগবেন।'

একে একে চারটে কাঁচা তরতাজা দাঁত তুলে ফেলতে হ'ল। এত ধকল গেছে দাঁতের ওপর দিয়ে। তাই বলে ক্যান্সার। এ তো দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। শুনি যে পান খেলে ক্যান্সার হ'তে পারে। জীবনে কখনো পান খাইনি। সুপুরি চিবোইনি। তাহলে ?

ডাক্তার প্রথম যখন বলেছিলেন ক্যান্সার হওয়া বিচিত্র নয়, তখনো এতটা গুরুত্ব দিইনি। কারণ দাঁত নিয়ে কষ্ট পাওয়া আমার তো আশৈশব ব্যাপার। মাড়ির দাঁত তোলার পরও ভোগান্তির শেষ হয়নি। আজ এখানে নড়ে, কাল ওখানে কন্‌কন্ করে। ১৯৮১ সালের মাঝামাঝি ডানপাশের দুটো দাঁতের গোড়ার ভেতরের মাড়িতে একটু ঘায়ের মতো দেখা গেল। ডাক্তার একটা মলম দিলেন। কয়েকদিন লাগানোর পর ভাল হয়ে গেল। মাসখানেক পরে আবার ঐ একই জায়গাতে ঘা টা দেখা দিল। খুবই নিরীহ চেহারার ঘা, ব্যথা নেই, কেবল সাদাটে রঙের একটু উঁচুমতো। আঙ্গুল দিলে খসখসে লাগে। তখন আমি নানা কাজে খুবই ব্যস্ত। মরবার ফুর্সৎ নেই— এমনই ব্যাপার। মাড়ির ব্যথাহীন নিরীহ ঘা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। ক্যান্সার হ'তে পারে কথাটা বলেছিলেন, বাড়ির কাছে বসেন এমন এক নবীন দাঁতের ডাক্তার। আমার ত্রিশবছরের পুরোনো দাঁতের ডাক্তার ফখরুজ্জামানের চেম্বার বাসা থেকে বেশ দূরে - - - বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে। অঝোর বর্ষার সময় এত দূরে যেতে পারিনি বলে পাড়ার ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম। এখন আবার তাঁর কাছে ছুটলাম। তিনি সব শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন, 'আরে দূর। ক্যান্সার হওয়া কি এত সহজ? আপনি কয়েকদিন রোজ আসুন। আমি..... এ্যাসিড দিয়ে মাড়ির জায়গাটা ওয়াশ করে দেব। ক'দিনেই ভাল হ'য়ে যাবে।'

কি অ্যাসিড দিয়ে ধুতে চেয়েছিলেন, সে নামটা এতদিন মনে নেই। যাই হোক বেশ কয়েক সপ্তাহ গেলাম। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। ওটা কমেও না। আবার বাড়েও না,

কেবল ওখানকার দাঁত দুটো একটু বেশি নড়বড় করে। ততদিনে আমার মনে একটু একটু ভয়ের ছায়া পড়তে শুরু করেছে। কি করি? বোন, বোন-জামাই, ননদ, নন্দাই, ভাগনে, ভাগনী, ভাগ্নে ভাগ্নি- - - সবাইকে জিজ্ঞেস করি, কেউ কোন সঠিক পরামর্শ দিতে পারেনা। শোনা মাত্র সবাই প্রথমে ভয় খায় তারপর আশ্বাস দেয়, 'আরে নাঃ। আপনার ওসব হ'তে যাবে কেন?' যেন ক্যান্সার হয় লোক বেছে বেছে।

এই করতে করতে আরো দুতিনমাস গেল। একজন বললেন, গুলশানে একটা দাঁতের ক্লিনিক আছে, আমেরিকানরা চালায়। ওখানে দেখাতে পারেন। ছুটলাম সেখানে। ক্লিনিকের ভেতরে ঢুকেই মন ভাল হ'য়ে গেল। ইস্। এযে একেবারে খোদ আমেরিকার কোন ডেন্টাল ক্লিনিকের মতো দেখাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে আমেরিকায় এক দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে চিকিৎসা করিয়েছিলাম; তখন দেখেছি ওদের ঘর-দুয়োর, যন্ত্রপাতি, চেয়ারের ঝকঝকে চেহারা। এরা এখানে হুবহু ঐ রকম চেয়ার এনে বসিয়েছে, ঐ রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, দাঁতের জন্য আলাদা বিশেষ ধরনের এক্স-রে মেশিন। দেখেশুনে ওদের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল। ভাবলাম, যাক, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এবার আমার সঠিক চিকিৎসা হ'বে।

দুজন ডাক্তার পরীক্ষা করলেন আমায়। দুজনই খাস্ আমেরিকান, দাঁতের ডাক্তারীর যথাযোগ্য ডিগ্রিধারী। এদেশে আছেন একটা খ্রীষ্টান মিশনারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এঁদের বেশির ভাগ কাজই সেবামূলক এবং তা বাংলাদেশের মফস্বলশহর ও গ্রামে গঞ্জে- - -দরিদ্রদের মধ্যে। এঁরা আমায় পরীক্ষা করে দাঁতের এক্স-রে ছবি তুলে দেখে, আমায় অভয় আশ্বাস দিলেন, 'কোন সমস্যা নেই, ক্যান্সারের কোন নাম নিশানাও তো দেখছিনা। তুমি তিনবেলা গ্যাকোফেক্স দিয়ে কুল্লি করবে আর টুথব্রাশ দিয়ে খুব জোরে জোরে মাড়ি ঘষে ধোবে।'

ডাক্তার শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ একশিশি গ্যাকোফেক্স উপহার দিলেন। বাড়িতে এসে দেখি শিশির গায়ে ওষুধের সঙ্গে পানি মেশাবার মাপ লেখা আছে- - -এক ভাগ গ্যাকোফেক্সের সঙ্গে পাঁচ ভাগ পানি মিশিয়ে কুল্লি করবে। আমেরিকান ডাক্তার সেখানে আমাকে একভাগ ওষুধ তিনভাগ পানি মিশিয়ে অর্থাৎ অনেক বেশি কড়া করে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি ভাল মন্দ বিচার না ক'রে ডাক্তারের নির্দেশ-মাফিক কুল্লি করতে এবং মাড়িতে ব্রাশ ঘষতে লাগলাম রোজ তিন বার ক'রে।

মাসখানেকে মাড়ির অবস্থা আরো খারাপ হ'ল। তখন আর আমেরিকান ডাক্তারের ওপর আস্থা রাখতে পারলাম না। দিশেহারা হ'য়ে একবার মেডিক্যাল কলেজের দন্তবিভাগে যাই, আবার কারো পরামর্শে অন্য কোন বড় দন্তচিকিৎসকের চেম্বারে যাই। এই করে করে আরো দুতিনমাস কাটল। এখন একটু একটু ঘুষঘুষে জ্বর হয়। নড়বড়ে দাঁত দুটোর গোড়ায় ব্যথা হয়। ওইখানে কিছু চিবোনো যায় না। সাদাটে রঙের ফাঙ্গাসের মতো ঘা টাও একটু বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে মাড়ির গায়ে।১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চের দিকে হঠাৎ আমি ভয় খেয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি যদি ক্যান্সার হ'য়ে থাকে? তা'হলে কি করব? বায়োপ্সি করলে বোঝা যাবে। কিন্তু যা উল্টোপাল্টা চিকিৎসা হ'ল এই কয়মাসে। তাতে

এখানে বায়োপ্‌সি করাতেও তো ভয় হচ্ছে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই বলল, 'জামীর কাছে চলে যাও।'

সত্যিই তো। জামীর কাছে যাওয়ার কথা ভাবছিনা কেন? আসলে ক্যান্সার যে আমার হতে পারে, এটাই তো মনকে বিশ্বাস করাতে পারিনি। এতো সামান্য উপসর্গ, এরচেয়ে কতবেশি হয় কত লোকের। ওষুধপত্র করে সেরে যায়। আর আমার তো তেমন কিছু নয়। সামান্য একটু ঘা, তার ব্যথা বেদনাও তেমন নেই, দুটো দাঁত নড়ে । সেতো কত লোকেরই নড়ে। তুলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়। তাহলে এতদিন তুলিনি কেন?

ডাক্তাররাই বা তোলার কথা বলেনি কেন?

কে জানে !.....

জামী এমনিতেও চিঠি লিখছিল বারে বারে, 'মা দুতিন বছর আসোনি এবার সামারে অবশ্যই আসবে বেড়াতে।

তা সামার অর্থাৎ জুন-জুলাই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সাহস হ'ল না। মে মাসেই টিকেট কেটে রওনা দিলাম মিশিগানের পথে- - -জামীর কাছে।

॥২॥

আগে প্রতিবার মিশিগান যাবার পথে লন্ডনে থামতে হ'ত এক দেড় মাসের জন্য। এখানে আছে ভাইয়েরা, বোনের মেয়েরা, বন্ধুরা। প্রত্যেক বাড়িতেই পালা করে থাকতে হ'ত। এবার অসুখের চিকিৎসা করাতে যাচ্ছি আমেরিকায় । তা আবার যে সে অসুখ নয়, খোদ ক্যান্সারের আশংকা। বেশি দেরি করা উচিৎ হবেনা। তাহ'লে ক্যান্সার (যদি তাই হয়) কুপিত হ'য়ে উঠতে পারে। সেই কারণে এবার লন্ডনে যাত্রা-বিরতির মেয়াদ একসপ্তাহের বেশি রাখিনি। ঢাকা থেকেই টিকেটে সেইমতো তারিখ বসিয়ে এনেছি। উঠেছি ছোট ভাই সিরাজুর রহমানের (বিবিসির) বাড়িতে। কিন্তু আমি মাত্র একসপ্তাহ থাকব শুনে সিরাজ মুখ ভার করে ফেলল। ওর বউ সোফিয়াও মর্মাহত। ১৯৭৪ সালে এদের বাড়িতে পৌনে দুমাস ছিলাম। সে সময় আমার ওজন তিরিশ পাউণ্ড কমে কংকালসার হ'য়ে গিয়েছিলাম। তখন এই সিরাজই প্রতি শনিবার নিজে বেছে বেছে বাজার করে নিজের হাতে মাছ রান্না করে কতো যত্নে আমাকে খাইয়েছে স্বাস্থ্য ভালো ক'রে দেবার জন্য। ১৯৭৯ সালেও এসে দেড়মাস ছিলাম সিরাজের এই বাড়িতেই। আর এবার কিনা মাত্র এক সপ্তাহ! আমি বুঝিয়ে বললাম দেখ চিকিৎসা তো এখানে করাব না, করাব আমেরিকায়। তাই এবার এখানে বেশি দেরি করা ঠিক হবেনা। যদি বল এখানে চিকিৎসা করার সুবিধে হবে, তাহলে এখানেই না হয় থেকে যাই।

কিন্তু লন্ডনের ন্যাশনাল হেলথ্‌কেয়ার সিস্টেমে বহিরাগত কারো বিনা বা কম খরচে চিকিৎসা করার কোন সুযোগ নেই। তাই এ প্রশ্নে সিরাজ চুপ করে থাকল। কিন্তু আমি যখন আবার বলতে শুরু করলাম অসুখটা যদি ক্যান্সারই হয়, তাহলে এখানে অযথা দেরি

করা উচিৎ হবেনা—তখন সিরাজ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল আমার 'অমূলক' আশংকা- - -
'দুর। ওসব ক্যান্সার -ফ্যান্সার কিছু হয়নি তোমার বুবু। ওরকম মাড়ি ফোলা দাঁত নড়া দুনিয়াশুদ্ধ লোকের হচ্ছে। তুমি অন্ততঃ আরেকটা সপ্তাহ বাড়িয়ে নাও।'

সিরাজ-সোফিয়ার পুত্রবধু শিরিনও খুব মর্মাহত, আমি এবার লন্ডনে বেশিদিন থাকব না বলে। শিরীন আমার সেজো বোনের মেয়ে, সিরাজ সোফিয়ার ছেলে স্বপনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে মাত্র পাঁচ মাস আগে। তাদের নতুন জীবনের নতুন সংসারে, তাদের পাখির নীড়ের মতো 'ভালবাসায়' আমি কিছুদিন থাকব না—এটা সে ভাবতেই পারছেনা। বাবা-মা, ভাই-বোন ছেড়ে সুদুর লন্ডনে স্বামীর ঘর করতে এসেছে—স্বভাবতঃই তাদের জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে; আর এখন তার বড়খালা এখানে এসেও তার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাবে না?

অতএব লন্ডনে আরেক সপ্তাহ থাকার মেয়াদ বাড়ানো হল। মন খুঁত খুঁত করতে লাগল—ঢাকায় কয়েকমাস অযথা দেরি হয়েছে। সঠিক পন্থায় চিকিৎসার অনুসন্ধান হয়নি। লন্ডনেও এই দুইসপ্তাহে কোন প্রাথমিক চেক-আপের কাজও কম খরচে করানোর কোন উপায়ই নেই। আর আমি যখন আমেরিকাতেই চিকিৎসা করাব বলে স্থির করেছি, তখন লন্ডনে বহিরাগত পেশেন্ট হিসেবে বার বার পয়সা খরচ করার কোন মানে হয় না। আবার একেবারে কিছু না করিয়েই দু'দুটো সপ্তাহ এমনি হেসে খেলে, দাওয়াত খেয়ে, বেড়িয়ে কাটাব? যদি এরি মধ্যে অসুখ আরো বেড়ে যায়? কিন্তু ওই অসুখটা যে হ'তে পারে, সেই কথাটাই যে কেউ মানতে চাচ্ছে না। সবাই বলছে দুর। তোমার কেন ক্যান্সার হতে যাবে। আমার খুঁত খুঁতোনি দুর করার জন্য সিরাজ তার বন্ধু এক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর চেম্বারে বসিয়ে এমনি একটু দেখে-টেখে বললেন, বায়োপসি না করে তো কিছু বলা যাবে না। তা আপাততঃ এককোর্স অ্যান্টি বায়োটিক খান, এমনি ইনফেকশান যেটা, সেটা ভাল হ'য়ে যাবে।

বায়োপসি না করে যে ক্যান্সারের বিষয়ে কিছু বলা বা জানা যাবে না সেতো আমিও জানি। ঢাকায় দুবার বায়োপ্সি করার উদ্যোগ নিয়েও বায়োপ্সি করানো হয়নি।সে আরেক কাহিনী। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা পুরে মুখে হাসি টেনে দু'সপ্তাহ লন্ডনে রইলাম সিরাজ সোফিয়া আর শিরীন স্বপনের বাড়িতে। তাদের সাথে অন্য আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িতে বেড়ালাম। খেলাম। ফ্রাংকফুর্টে আমার সব ছোট ভাই মোস্তফা কামাল (পাশা) থাকে, তার সঙ্গে ফোনে বেশ কয়েকবার কথা বললাম। আমি যে এ যাত্রা ফ্রাংকফুর্টে যেতে পারলাম না সেজন্য সেও মর্মাহত। ১৯৭৭ সালে ফ্রাংকফুর্টে গিয়েছিলাম তার ছবির মত সুন্দর করে সাজানো ফ্ল্যাটে। তার সঙ্গে গাড়িতে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম ইয়োরোপের কয়েকটা দেশে— সাতাত্তরের উজ্জ্বল গ্রীষ্মের সেইসব মধুর স্মৃতির কথা মনে করে আমিও দীর্ঘঃশ্বাস ফেললাম।

তিরিশে মে গিয়ে নামলাম মিশিগানের ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে। ডেট্রয়েট থেকে ২৫/২৬ মাইল দুরে ওকল্যান্ড কাউন্টিতে ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ড শহরে জামীদের বাস। তার মহল্লার

নাম কীগো হাবরার। সেখান থেকে কয়েকমাইল দূরেই আমার আরেক ভাই শামসুল হকের বাড়ি—রোলিং রিজ রোডে। গত কুড়ি বাইশ বছর ধরে শামু এখানেই আছে। এদেশেরই নাগরিক, প্রতিষ্ঠিত সাইকিয়াট্রিস্ট।

আমি পৌঁছোনোর আগেই জামী শামুর সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছিল কোন ডাক্তারকে দেখানো যায়। অন্য সব চিকিৎসার মতো, দাঁতের চিকিৎসাও এদেশে হাইলি স্পেশিয়ালাইজড্। যিনি দাঁত তোলেন, তিনি মাড়ির চিকিৎসা করেন না। যিনি মাড়ির রোগ নির্ণয় করেন, তিনি আবার রুট ক্যানালিং করেন না। ১৯৭৪ সালে আমি দাঁতের সাধারণ চেক-আপ, স্কেলিং এবং রুট ক্যানালিং-য়ের জন্য তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। এবার আমাকে দেখবেন মুখের ক্যান্সার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এক ডেন্টাল সার্জন। তাঁর নাম ডাঃ রবার্ট ম্যাকিন্টশ। শামু এবং তার স্ত্রী জোসেফিন দুজনেই বলল, ডাঃ ম্যাকিন্টশ খুব দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং নামকরা ডাক্তার।

গেলাম তাঁর চেম্বারে। মেইপ্‌ল্ রোডের একপ্রান্তে বেশ প্রশস্ত একটা জায়গা, টালির ছাদ দেওয়া অনেক গুলো একতলা ছোট ছোট ঘর — এটা হ'ল ব্রুমফিল্ড হিল্‌স্ মেডিক্যাল ভিলেজ। এখানে অনেকগুলো ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের চেম্বার (এদেশে অফিস বলে)। এরই একটা চেম্বার ডাঃ ম্যাকিন্টশ এবং তাঁর সহযোগী আরেক ডাক্তার লেপজেক -এর। ঢুকেই প্রথমে রোগীদের বসার ঘর, খুব সুন্দর ভাবে কার্পেট ও গদী-মোড়া সুদৃশ্য চেয়ার দিয়ে সাজানো। সেন্টার ও সাইড টেবিলগুলো ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে বিভিন্ন রকম ম্যাগাজিনে। ঘরের একপাশের দেয়ালে একটা কাঁচের স্লাইডিং জানালা, আমরা ঘরে ঢোকার পর জামী সেই স্লাইডিং জানালার ঘষা কাঁচ সরাতেই দেখতে পেলাম ওপাশে বসা নার্সের মুখ। জামী তাকে আমার নাম বলতেই তিনি হেসে বললেন, হ্যাভ এ সীট প্লীজ।

আমরা দুজনে বসে দুটো ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিলাম। দেখলাম বিভিন্ন ধরণের ম্যাগাজিন রয়েছে — গুরুগম্ভীর থেকে হালকা চটুল বিনোদন ম্যাগাজিন। অর্থাৎ সব ধরণের পাঠকের মনমতো ম্যাগাজিন রাখা হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য অনেক ছড়াছবির বই।

রিসেপসন নার্সের জানালার পাশের দেয়ালে একটা বন্ধ দরজা রয়েছে। মনে হ'ল ওটি ভেতরে ঢোকার জন্য। আমার অনুমান মিথ্যে নয়। খানিকপরে দরজাটা খুলে গেল। অন্য একজন নার্স মুখ বাড়িয়ে মিষ্টি স্বরে ডাকলেন, 'মিসেস ইমাম'। আমরা দুজন উঠে দাঁড়ালাম। নার্স বললেন 'আমার সঙ্গে আসুন। তাঁকে অনুসরণ করে করিডর দিয়ে হেঁটে একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম চার-পাঁচটি ঘর রয়েছে, প্রত্যেকটি ঘরেই একটি ক'রে ডেন্টাল চেয়ার, পাশে টেবিলে নানারকম শিশি বোতল, দেয়ালে ঝোলানো নানারকম নল আর যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে। নার্স ঘরে ঢুকে, ঘরের মাঝখানে রাখা ডেন্টাল চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে সেখানে বসতে বললেন। আমি বসার পর তিনি চেয়ারটা একটা লেভার টিপে পেছনে হেলিয়ে দিলেন, আমার গলায় পরিয়ে দিলেন একটা পাতলা কাগজের তোয়ালে।

'দ্য ডক্টর উইল বি উইথ্ ইউ ইন এ মোমেন্ট' বলে নার্সটি বেরিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। জামী ঘরের কোণে রাখা একটা গোল ছোট্ট রিভলভিং টুলে ব'সে

রইল। কারো মুখে কোন কথা নেই। আমি ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম — ঘরের দেয়াল, কার্পেট, আসবাব সবই কেমন ঝকঝক তকতক করছে। একটা দেয়ালে মাঝারি মাপের পেইন্টিং ঝুলছে। এইরকম ঘরে বসামাত্র মন ভাল হয়ে যায়। ভয় ডর কমে যায়। একটু পরে ডাঃ ম্যাকিন্টশ এলেন। মাঝারি উচ্চতার মধ্যবয়সী হাসিখুশি মানুষ — খুব আন্তরিক সুরে অনর্গল কথা বলে যাবার অভ্যাস দেখলাম। আমার মুখের ভেতরটা ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে বললেন, বায়োপ্‌সি করার আগে সঠিক ক'রে কিছু বলা যাবে না। তবে মিসেস ইমাম, আপনার মাড়ি আর দাঁতের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনার ক্যান্সার হয়নি।

শুনে মন থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল। হে ঈশ্বর, তাই যেন হয়। বায়োপ্‌সি করার জন্য দাঁতের গোড়া থেকে একটুখানি মাড়ি কেটে নিতে হবে। আমি বললাম, 'যে দাঁত দুটো নড়ছে, ওদুটোর জন্য খেতে অসুবিধে হ'চ্ছে। ও দুটো তুলে ফেললে হয়না?'

ডাঃ ম্যাকিন্টশ বললেন, 'তাই হবে।'

তিনি বায়োপ্‌সি করার জন্য তিনসপ্তাহ পরের একটা ডেট দিতে চাইলেন। আমি বললাম, 'বায়োপসিটা তাড়াতাড়ি করে ফেললে ভাল হ'ত না কি? যদি ক্যান্সারই হ'য়ে থাকে —' বলতে যাচ্ছিলাম, 'তাহলে দেরি করা ঠিক হবেনা।' কিন্তু ডাক্তার আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন', বিলিভ মি মিসেস ইমাম, ক্যান্সার আপনার হয়নি। আমি তো সব সময় এই মুখেরক্যান্সারই দেখি, আপনার মাড়ির যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এটা কিছুতেই ক্যান্সার হ'তে পারে না।'

আমি গোঁ ধরে বললাম, 'তা না হয় না হ'ল। তবু তিনসপ্তাহ দেরি করার দরকারটা কি? আপনি এখুনিই তো বায়োপ্‌সিটা করে নিতে পারেন।'

ডাক্তার আমার অজ্ঞতায় শুধু একটু হাসলেন, সদয় কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে এক্ষুনি একটা জরুরী অপারেশান করতে যেতে হবে। আমার সহযোগী ডাক্তার লেপজেকও আজ খুব ব্যস্ত।'

আমি এমনিতে আছি ভালোমানুষ কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ঘাড় ত্যাড়া হ'য়ে যায়। আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না, ডাক্তারকে অনুরোধ উপরোধ জিদ ক'রে বায়োপসির অ্যাপয়েন্টমেন্ট একসপ্তাহ পরের একটা তারিখে ক'রে নিলাম।

একসপ্তাহ পরে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে শুনলাম ডাঃ ম্যাকিন্টশ হাসপাতালে জরুরী অপারেশানে ব্যস্ত। তাঁর সহযোগী ডাক্তার লেপজেক আমার দাঁত তুলে বায়োপসির জন্য একটুখানি মাড়ি কেটে নেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করবেন।

ডাঃ লেপজেক এলেন। ইনি ডাঃ ম্যাকিন্টশের চেয়ে বয়সে তরুণ, মাথায় অনেক লম্বা, অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান। ডাঃ লেপজেক প্রথমে ব্যাখা ক'রে বললেন, তিনি কি করতে যাচ্ছেন। তিনি প্রথমে একটা ইনজেকসান দেবেন আমার দাঁতের গোড়া অবশ করার জন্য। তারপর তিনি দাঁত দুটো তুলবেন এবং দাঁতের গোড়ার মাড়ি থেকে একটুখানি টুকরো কেটে তুলবেন বায়োপসির জন্য। শুনতে শুনতে হঠাৎ নার্ভাস বোধ ক'রলাম। যদি ইনজেকসানে ঠিকমতো অবশ না হয়? যদি দাঁত তুলতে বিষম ব্যথা লাগে? দেখি কি, আমার চেয়ে

ডাক্তার কিছু কম নার্ভাস হননি। তাঁর পেশেন্টের ব্যথা লাগলে পেশেন্টের চেয়ে তাঁরই যেন বেশি মাথাব্যথা।

ইনজেকসান দেয়ার পর দাঁত তোলার আগে পর্যন্ত যে কয়টি মুহূর্ত, তার স্থায়ীত্বকাল মনে হয় অনন্ত। সেই অন্তবিহীন সময়টুকু পেরিয়ে ডাক্তার সাঁড়াশী হাতে নিয়ে আমার মুখ হাঁ করিয়ে দাঁতদুটো তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সহর্ষে বলে উঠলেন, 'উই ডিড ইট। উই ডিড ইট।'

আমেরিকার ডাক্তারদের এই এক অদ্ভুত অভ্যেস। সব সময় রোগীকে নিজের সঙ্গে যুক্ত ক'রে কথা বলবেন। তাঁদের ধারণা, এতে রোগী খুব নিরাপদ এবং আত্মিক বোধ করে। এনিয়ে আবার ঠাট্টাও চালু আছে এদেশে। যেমন, ডাক্তার রাউণ্ডে এসে রোগীকে জিজ্ঞেস করছেন, 'হাউ আর উই টুডে?'

চেম্বার থেকে চলে আসার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'বায়োপসির রেজাল্ট জানা যাবে কবে?' জবাব পেলাম, তিন সপ্তাহ পরে।

তি- - -ন সপ্তাহ। এত দেরি লাগবে? আবারো জবাব পেলাম, বায়োপসি করতে এতটাই সময় লাগা দস্তুর।

সর্বনাশ। জেদ করে আগে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নিলে বায়োপসির ফলাফল জানতেই তো দেড়মাস লেগে যেত।

যাক্ সে - - - এখন তো আর করার কিছু নেই। বায়োপসির রেজাল্ট জানার সময়টা আর এগিয়ে আনা যাবে না জেদ ক'রে। তাতে রেজাল্ট ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।

এখন এই তিনসপ্তাহ খাও, দাও, বেড়াও। ভাবনা চিন্তাহীন হ'য়ে ফূর্তি করো। তাছাড়া ডঃ ম্যাকিন্টশ তো দরাজভাবে বলেই দিয়েছেন, ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা খুব কম।

॥৩॥

'মিসেস ইমাম, আই হ্যাভ্ ব্যাড্ নিউজ ফর ইউ।'

এবার আর 'উই' নয়, রোগীর সঙ্গে একাত্মবোধ ক'রে 'আমরা' নয়, এবার সরাসরি তুমি।' 'তোমার' ক্যান্সার হয়েছে, 'আমাদের' নয়।

ঢাকার ডাক্তারের মন্তব্য — 'ক্যান্সার হওয়া বিচিত্র নয়' থেকে শুরু ক'রে এখানে আজকে ডাক্তারের মুখ থেকে এই রিপোর্ট শোনা অবধি সময়ে মুখে বহুজনকে বহুবার অবলীলায় বলেছি, 'আমার ক্যান্সার হতে পারে', 'ক্যান্সার হওয়া বিচিত্র নয়', 'ডাক্তাররা ক্যান্সার বলে সন্দেহ করছেন।' কিন্তু মনের অর্ধচেতন, অবচেতন স্তরে কি সত্যি সত্যি ভেবেছি আমার ক্যান্সার হবে? ভাবিনি। ভাবিনি বলেই এরকম অবলীলায় বলতে পারেছি। এখন ডাক্তারের মুখে এই কথা শোনার পর চুপ করে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না।

আজ এত বছর পরে মনে হ'চ্ছে সেদিন কি আমার অবস্থাটা বাজ পড়া তালগাছের মতো হয়েছিল? নির্জন অন্ধকার প্রান্তে তালগাছ দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তীব্র বিদ্যুৎ ঝলকে মুহূর্তের জন্য চরাচর উদ্ভাসিত ক'রে বাজ নেমে এল তালগাছের মাথার ওপর। একেবারে

শেকড় পর্যন্ত দগ্ধ ক'রে দিয়ে গেল। তক্ষুনি বোঝা গেলনা কি মহা সর্বনাশটা ঘটে গেল। গাছটা আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল। কেবল তার সবুজ পাতাগুলো পুড়ে কুঁকড়ে কালো হয়ে গেল, তার ভেতরের সব প্রাণরস শুকিয়ে তাকে একখণ্ড পোড়াকাঠ বানিয়ে দিল।

সেদিন ডাক্তারের চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরে শান্ত মাথায় ভাবতে বসলাম। এ দেশে চিকিৎসার খরচ অসম্ভব বেশি। তাই সবাই চড়া প্রিমিয়ামে হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স ক'রে রাখে। আমার তো হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স নেই। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ আমাকেই বহন করতে হবে। বিদেশে এত ডলার পাব কোথায়? জামীর আবার বর্তমানে চাকরি নেই। ও যে কোম্পানিতে চাকরি করত সেই কোম্পানি মিশিগান থেকে উঠে সাউথ ক্যারোলাইনা চলে গেছে। জামী মিশিগান ছেড়ে যেতে চায়নি, কারণ ওর তিনমামা, একখালা, শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা সবাই এখানে। তাই সে চাকরিটাই ছেড়েছিল। ভেবেছিল আরেকটা চাকরি সহজেই জুটিয়ে নেবে। সেটা এ দেশে খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু দেশে যে কিছুদিন থেকে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে, সেটার কথা মাথায় আসেনি জামীর। চাকরি ছাড়ার পর দেখে আরেকটা চাকরি সে সহজে পাচ্ছে না। কারণ সারা আমেরিকায় বেকারত্বের হার যেখানে নয় পার্সেন্ট, শুধুমাত্র মিশিগান স্টেটেই সেই হার চোদ্দ পার্সেন্ট। এইরকম অবস্থায় জামীই বা কোথা থেকে দেবে এই হাতী-পোষার খরচ?

তাছাড়া এখনো যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হ'তে চাচ্ছে না যে, আমার সত্যি সত্যি ক্যান্সার হ'য়েছে। কোথাও কোন ভুল হয়নি তো? বায়োপ্সি করার সময় আমার স্যাম্পল অন্য কারো স্যাম্পলের সঙ্গে উল্টোপাল্টা হ'য়ে যায়নি তো? . . . . . দূর। কি সব আবোল তাবোল ভাবছি। যে শুনবে সেই বকা দেবে আমায়। আমি তবু ধুঁত ধুঁত করতে করতে বললাম, 'একটা সেকেণ্ড ওপিনিয়ন নিলে হ'ত না?'

এদেশে কোন জটিল রোগ নির্ণয়ে দ্বিতীয় একজন ডাক্তারের মতামত নেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। শামু বলল, তা নেওয়া যেতে পারে। একটা বোন্-স্ক্যান করে দেখা ভালো।

বোন্-স্ক্যান ক'রলে বোঝা যাবে আমার মাড়ির ক্যান্সার চোয়ালের হাড়েও ছড়িয়েছে কি না। চোয়াল ছাড়াও শরীরের অন্য কোথাও হাড়ে ক্যান্সার থাকলে তাও ধরা পড়বে। সেইন্ট জোসেফ মার্সি হাসপাতালে বোন্-স্ক্যানের ব্যবস্থা করা হ'ল। আমার আরেক ভাই ডাঃ মোশারফ আহমদ (মাদু) সেইন্ট জো-তে কাজ করে। বোন্-স্ক্যানের সময় সে একবার উঁকি দিয়ে গেল 'বুবু, কোন চিন্তা করবেন না। স্ক্যানিং শেষ হ'লে বাড়ি চলে যান। রিপোর্ট ডাঃ ম্যাকিন্টশের কাছে পাঠাবার আগে আমি একবার দেখে নেব। রাতে ফোনে আপনাকে জানাব।'

চোয়ালের হাড়ের মধ্যেও ক্যান্সারের জীবানু খানিকটা ঘাটি দখল ক'রে বসেছে। মাদু বলল, 'একটু যেন আথ্রাইটিসেরও ভাব দেখা যায়। তবে তেমন কিছু নয়। খুবই সামান্য একটুখানি আভাস মাত্র। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। তাই সেই ১৯৮২ সালে ধারণাও করতে পারিনি যে, ঐ আথ্রাইটিসের 'আভাসটুকু' পাঁচবছর পরে গায়ে গতরে শক্তিশালী হ'য়ে আমাকে কাবু ক'রে

ফেলবে। তখন আর্থ্রাইটিসের কথা কে ভাবে? তখন ক্যান্সার নিয়ে সবার মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

ডাঃ ম্যাকিন্টশ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন কিভাবে চিকিৎসা হবে। ক্যান্সারের মতো মারাত্মক ঘাতক রোগের আজ পর্যন্ত কোন ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এখনো পর্যন্ত অপারেশানই হচ্ছে ক্যান্সার নিরাময়ের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। যেহেতু মাড়ি ও চোয়ালে আমার ক্যান্সার বেশিদূর ছড়ায় নি, সেইজন্যই অপারেশান ক'রে ওটা নির্মূল করা সম্ভব। আর যেহেতু ডান চোয়ালের নিচে গলার লিম্ফ্ গ্ল্যাণ্ডগুলো ফোলা দেখায় এবং ওগুলোর মাধ্যমেই ক্যান্সার জীবানু নিচে নেমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ; সেহেতু ওই লিম্ফ্ গ্ল্যাণ্ডগুলোকেও কেটে বাদ দিতে হবে। তবে এ অপারেশানটা ডাঃ ম্যাকিন্টশ করবেন না। করবেন ঘাড়—গলার বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যাক্। তাঁর ফি আলাদা। এই দুই ডাক্তার মিলে যে অপারেশান করবেন, তারজন্য আমাকে দশবারোদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। হাসপাতালের কেবিন ভাড়া দৈনিক ৩৮০ ডলার। তাছাড়া প্রতিদিন যত ডাক্তার এসে দেখবেন, প্রত্যেকের আলাদা ফি। যতবার এক্সরে, ব্লাড, ইউরিন, স্টুল ইত্যাদি পরীক্ষা করা হবে, প্রতিবার প্রত্যেকটির আলাদা চার্জ।

বাড়ি ফিরে দ্বিতীয় দফায় মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে বসলাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, এদেশে অপারেশান করাব না। ঢাকা ফিরে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাব।

॥৪॥

শামু খুব ধীরস্থির মানুষ। সামনে কোন সংকট দেখা দিলে এবং সোজা পথে তার নিরসন না হ'লে সে বিচলিত হয়না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে থাকে, আর কি কি উপায়ে কোন কোন পথে সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

আমি যে বেঁকে বসেছি, কিছুতেই এদেশে চিকিৎসা করাব না, আমার ইনস্যুরেন্স নেই, আমি ঢাকা ফিরে গিয়ে হোমিওপ্যাথি করাব, তাতে জামী -. ফ্রিডা দুজনেই খুব বিচলিত হ'য়ে পড়েছে। খুব বোঝাচ্ছে আমাকে। শামু জোসেফিনও বোঝাচ্ছে। কারো কথা শুনছি না। শেষে শামু বলল, ঠিক আছে বুবু, এক্ষুনি আপনাকে মনঃস্থির করে ফেলতে হবে না। এই উইকয়েন্ডে আমাদের সঙ্গে ট্র্যাভার্স সিটিতে চলুন। সেখানে নিরিবিলি বসে আরো ভাবুন। আপনার সিদ্ধান্তের বিপক্ষ যুক্তিগুলোও আবার ভেবে দেখুন। তারপরে যা ভাল মনে করবেন, তাই করবেন। আমরা তা মেনে নেব।'

ট্র্যাভার্স সিটিতে শামুর একটা বাড়ি আছে — এক্কেবারে লেকের ওপর। এটা মিশিগানের উত্তর অংশে। এখানে শীত বেশি, তাই গ্রীষ্মকালে এখানে আরামদায়ক তাপমাত্রা থাকে। গ্রীষ্মে মিশিগানে ভীষণ গরম হয়। তাই সামার রিজর্ট বা শৈল—নিবাস হিসেবে অনেকে উত্তরের বিভিন্ন শহরে বাড়ি কিনে রাখে। পুরো গ্রীষ্মকালটা শামু প্রতি শনিবার ছুটির দিনে ট্রাভার্স সিটিতে যায়, থাকে। লেকে মাছ ধরে, বেড়ায়, বিশ্রাম করে। প্রতি সপ্তাহান্তেই কোন—না—কোন বন্ধুকে বা আত্মীয়কে দাওয়াত করে নিয়ে যায়। এবারে আমাদের নিয়ে চলেছে। ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ড থেকে তিনচার ঘন্টার রাস্তা। ঠিক হ'ল আমি, শামু ও

জোসেফিনের সঙ্গে তাদের গাড়িতে শুক্রবার বিকেলে রওনা দেব। শনিবার শামু কাজ করে না কিন্তু ওদিন ১২ টা পর্যন্ত জামী এবং ফ্রিডা দুজনেরই অফিসে কাজ আছে। ওরা কাজ সেরে শনিবার বিকেলে তাদের নিজেদের গাড়িতে ট্র্যাভার্স সিটি রওণা দেবে।

ট্র্যাভার্স সিটিতে সেই শুক্রবারের সন্ধ্যায় ডিনারের পর শামু আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক দিক থেকে আক্রমণ করল। সে বলল, 'বুবু আপনি যদি এখানে চিকিৎসা না করিয়ে দেশে ফিরে যান, তাহলে কোন সন্দেহ নেই আপনি মারা যাবেন। তাহ'লে কিন্তু জামীর মনের শান্তি চিরকালের জন্য নষ্ট হ'য়ে যাবে। ভেবে দেখুন, সে আপনার একমাত্র সন্তান, সবে-ধন-নীলমনি। তার তো আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি কি তাকে এই মনঃকষ্টে ফেলবেন?'

এ দিকটা সত্যি ভেবে দেখিনি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তার বাবা আর একমাত্র ভাইকে হারিয়ে জামী অল্প বয়স থেকেই আমার একক সন্তান হিসেবে বড় হয়ে উঠেছে। আমি এই মা ছাড়া রক্তের সম্পর্কের সত্যিই তো আর কেউ নেই। জামীর মুখটা মনে করে আমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

শামু বলল, 'টাকার জন্য এত ভাবছেন কেন? আমি নেই? আজ যদি আমার মা কিংবা বউ কিংবা ছেলের এরকম অসুখ হ'ত, তাহ'লে কি টাকার জন্য চিকিৎসা আটকে থাকত? তাছাড়া জামীও তো শীগগীরই আরেকটা চাকরী পেয়ে যাবে।'

আমার চোখ পানিতে ভ'রে উঠল। শামু আমার মায়ের পেটের ভাই না হ'লেও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সেই কবে- - -পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে - - - যখন ওরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র - - - তখন থেকেই শামু, মাদু, নাসির, মাহফুজ- - -এরা সবাই আমাকে বুবু বলে ডাকত, আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসত, খেত, রুমী-জামীর সঙ্গে খেলা করত, ওদের হস্টেলে মাস-পয়লা ভোজের দিনে আমাদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেত। সেইসম্পর্ক এই এত বছরে আপন ভাই-বোনের সম্পর্কের মতোই দৃঢ় এবং অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে।

শুক্রবার রাতে শামু যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিল, শনিবার দিনের বেলাতেও তা অব্যাহত রইল। শনিবার সকালে নাশতা খাবার পর আমরা সবাই শামুর বোটে চ'ড়ে লেকের বুকে বেড়ালাম। শামু তার স্বভাবসিদ্ধ ধীর, স্থির ভঙ্গিতে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে লাগল। শরীফের কথা, রুমীর কথা, জামীর কথা, কতো টুকরো টুকরো হাসি-ঠাট্টা মজার কথা। এসব শুনতে শুনতে আমার সমস্ত অতীত জীবনটাই যেন আমার চোখের সামনে আবার নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল।

শামুর যুক্তির জালে আমি ক্রমাগতই জড়িয়ে যেতে থাকলাম। তার সঙ্গে এসে যোগ হ'ল ফ্রিডার কয়েকটি সারগর্ভ কথা। ফ্রিডা ও জামী শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌছেছিল। রাতের ডিনার খাবার পর সবাই একত্রে বসে বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে আমার মগজধোলাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল। ভেতরে ভেতরে মনটা দ্রব হয়ে এলেও বাইরে তখনো ঘাড় ত্যাড়া করে ছিলাম।

রাতে আমার শোবার ঘরে বসে ফ্রিডা তার শেষ অস্ত্র ছুড়ল আমার প্রতি। সে বলল, 'মামনি, তুমি তোমার নাতি-নাতনি না দেখেই চ'লে যাবে? তোমার যে এত জ্ঞান, তোমার

সারা জীবনের এত অভিজ্ঞতা, সে সবের ভাগ তুমি তোমার নাতি-নাতনিদের না দিয়েই চ'লে যেতে চাও? তাদেরকে তুমি সেসব থেকে বাঞ্চিত ক'রবে? তুমি যে এবার স্ট্রবেরি ক্ষেতে স্ট্রবেরি তুলতে গেছিলে, কত রঙীন ফটো তুললে, বলছিলে বাচ্চাদের জন্য বই লিখবে। সে সব না ক'রেই তুমি ম'রে যেতে চাও?'

স্তব-স্তুতিতে পাথরের দেবতা পর্যন্ত গ'লে যান, মানুষ তো কোন ছার।

হ্যাঁ, স্ট্রবেরি ক্ষেতে ফল তুলতে গিয়েছিলাম বটে। বায়োপসির রিপোর্ট বেরোবার আগের তিনসপ্তাহ যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফূর্তি ক'রে বেড়িয়েছিলাম, সেই সময়ে।

স্ট্রবেরি ফল যখন পাকে, তখন এদেশের মানুষ সখ ক'রে ক্ষেতে ফল তুলতে যায়। আলু-ক্ষেতের মতো দেখতে স্ট্রবেরি-ক্ষেত। গাছও আলুগাছের মতো ছোট, ঝাঁকড়া। শুধু তফাত এই যে, আলু ধরে মাটির নিচে, স্ট্রবেরি ধরে মাটির ওপরে, গাছের ডালে। ক্ষেতের মালিক ক্ষেতে ঢোকার মুখে গেটের পাশে লোক বসিয়ে রাখে একগাদা টুকরি সহ। হাতল-লাগানো সাজির মতো দেখতে এই টুকরি নিয়ে সবাই ঢোকে ক্ষেতে। পাকা পাকা রসালো ফল ছিঁড়ে টুকরি বোঝাই করে। ফল তোলার সময় মুখে পুরে দেওয়া নিষিদ্ধ নয়। তাই একই সঙ্গে ফল সাজিতে তোলা আর মুখে পোরা - - - দুটো কাজই চলতে থাকে।

সে এক মহোৎসব। স্ট্রবেরির মতো চেরি ফল পাকার সময়ও লোকে এইভাবে চেরি বাগানে ফল তুলতে যায়। চেরিগাছ অবশ্য পাঁচ ছয়ফুট উঁচু ঝাঁকড়া হয়। বরই পাড়ার মতো পাড়তে হয়।

ফল তোলা শেষ হ'লে ভর্তি টুকরি গুলো নিয়ে গেটের কাছে এলে ওগুলো ওজন করা হয়। ওজন করার যন্ত্র নিয়ে লোক হাজির থাকে গেটে। যার যতটা ওজন হয়, সেইমতো দাম মিটিয়ে লোকেরা বাড়ি ফেরে টুকরি ভর্তি ফল নিয়ে।

স্ট্রবেরি তোলার সময় আমি অনেকগুলো রঙিন ছবি তুলেছিলাম, ফ্রিডাকে বলেছিলাম ভবিষ্যতে বাচ্চাদের জন্য বই লেখার ইচ্ছে আছে, তাতে এইসব ছবি ব্যবহার করব। আজ সেই কথা তুলে ফ্রিডা আমার মনের তন্ত্রীতে ঘা দিল। যে বই লিখব বলে ভেবেছি অথচ এখনো লেখা হ'য়ে ওঠেনি, সেই বইয়ের কথা ভেবে মনে আকুতির গুঞ্জন উঠল। যে নাতি-নাতনিরা এখনো জন্মায়নি, তাদের বুকে চেপে আদর করার জন্য আমার মনের ভেতর এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার জন্ম হ'ল।

এর ওপর শেষ খাঁড়ার ঘা-টা দিল জামী। মুখটা খুব নির্লিপ্ত ক'রে বলল, 'অপারেশান না ক'রে দেশে ফিরে গেলে তুমি যে মারা যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে খুব কষ্ট পেয়ে মারা যাবে। মাড়িতে ক্যান্সার এখন খুব কম জায়গায় আছে। কেটে বাদ দিলেই একদম ভালো হ'য়ে যাবে। তা না করলে, ওটা বাড়তে বাড়তে সারা মুখে, গলায়, বুকে, পেটে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে, অসহ্য কষ্ট হবে—'

'থাম। থাম। আর বলার দরকার নেই। ক্যান্সার রোগীর শেষ অবস্থার কথা কি আমি জানি না?'

আমার নিজের মাকেই তো দেখেছি। তাছাড়া বই, ম্যাগাজিনেও পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি।

আমার ভেতরের সব প্রতিরোধ যেন বিশাল এক বন্যার তোড়ে ভেঙে, গুড়িয়ে, ভেসে গেল।

আমি মিশিগানে থেকে অপারেশান করাতে রাজি হলাম।

শুনে সবাই সুখী। শামু সুখী, জামী সুখী, জোসেফিন সুখী, ফ্রিডা সুখী, ডাঃ ম্যাকিন্টশ সুখী।

বলাবাহুল্য, আমি নিজেও সুখী।

॥৫॥

জুলাই-য়ের ২ তারিখে অপারেশানের দিন ঠিক হয়েছে। এবার ডাঃ ম্যাকিন্টশ তারিখ দিতে দেরি করেননি। ক্যান্সার রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে আর দেরি করার বিধান নেই। যত তাড়াতাড়ি অপারেশান ক'রে ক্যান্সার-দষ্ট জায়গাটি ফেলে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

ডাঃ ম্যাকিন্টশ যে হাসপাতালে কাজ করেন, সেটার নাম হ'ল 'সাইনাই হসপিটাল অব ডেট্রয়েট (Sinai hospital of Detroit)। জামীর বাড়ি থেকে সেটা বিশ-বাইশ মাইল দূরে, ডেট্রয়েট শহরের উপকন্ঠে।

হাসপাতালে যাবার কয়েকদিন আগে ডাঃ ম্যাকিন্টশ একদিন তাঁর চেম্বারে বসে সমস্ত পদ্ধতিটা আবার আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন। অপারেশানের আগের দিন অর্থাৎ ১জুলাই যে কোন সময় আমার হাসপাতালের কেবিন খালি হ'তে পারে। হ'লেই হাসপাতাল থেকেই আমাকে ফোন ক'রে জানিয়ে দেওয়া হ'বে - - - কটার সময় হাসপাতালে যেতে হবে। যাবার পর অপারেশানের আগের যা যা প্রস্তুতি প্রয়োজন - - - বিভিন্ন ডাক্তার এবং নার্স তা করবেন। ২জুলাই দুপুর ১টার সময় আমার অপারেশান হবে।

এই পর্যন্ত তথ্যাদি মামুলী ছিল। তারপর ডাঃ ম্যাকিন্টশ যা বললেন, তাতে আমার রক্ত হিম হ'য়ে গেল। তিনি বললেন, যেহেতু ক্যান্সার জীবাণু চোয়ালের হাড়েও ছড়িয়েছে, সেহেতু চোয়ালের হাড়ের ওপরের অংশ যতটুকু দরকার কেটে বাদ দিতে হবে। চোয়ালের হাড় বেশ সরু, ক্যান্সারের জীবাণু হাড়ের কতটা অংশে ছড়িয়েছে, সেটা বোন স্ক্যান দেখে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অপারেশান করে চোয়ালের ওপরের মাংসে কেটে ফাঁক ক'রে দেখতে হবে হাড়ের কতটা অংশ কেটে বাদ দিতে হবে। এতখানি অংশ কাটতে হবে, যাতে সমস্ত জীবাণু নির্মূল করা যায়। যদি একটা মাত্রও ক্যান্সার জীবাণু থেকে যায়, তাহলে সেটা থেকেই আবার ছড়াবে। যদি দেখা যায় চোয়ালের হাড়ের খানিকটা অংশ পুরো কেটে ফেলতে হবে, তাহলে পরবর্তী কতকগুলো জটিলতার সৃষ্টি হবে। যেহেতু চোয়ালের এই সরু হাড়টাই এককানের নিচ থেকে থুতনি বেড়ে অপর কানের নিচ পর্যন্ত প্রসারিত থেকে মুখমণ্ডলের নিচের অংশকে একত্রে ধ'রে রেখেছে সেহেতু ডানদিকের গালের নিচে চোয়ালের হাড়ের ক্যান্সারদষ্ট অংশ পুরো কেটে ফেললে থুতনি নড়বড়ে হয়ে যাবে। ফলে ঠোঁটদুটো সহ মুখগহ্বরের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা- - -খাওয়া এবং কথাবলার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। ডাঃ ম্যাকিন্টশ যেভাবে হাতদিয়ে নিজের চোয়াল ও

থুতনি নাড়িয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছিলেন, তা শুনতে শুনতে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল উনি আমাকে একটা হরার মূর্তির গল্প শোনাচ্ছেন। তবে উনি আশ্বাসের বানীও শোনালেন। উরুর হাড় থেকে একটা টুকরো কেটে চোয়ালে জুড়ে দিলেই চোয়াল আবার আগের মতো হ'য়ে যাবে। তবে এই বোন-গ্রাফটিং এখনকার অপারেশানের এক/দুই বছর পরে করতে হবে। সে পর্যন্ত সময় উনি একটা প্লাস্টিকের ফেইসগার্ড (Face guard) দুই কানের নিচে চোয়ালের হাড়ে ফুটো ক'রে লাগিয়ে দেবেন, সেইটে কোনমতে ঠোঁট, মুখগহ্বর ও থুতনিকে একত্র ধরে রাখবে। পুরো ব্যাপারটা এমন অনায়াসে বলে গেলেন, যেন আর্ট এণ্ড ক্রাফটের ক্লাসে শিক্ষক বালিকা ছাত্রীকে শেখাচ্ছেন কিভাবে পিজবোর্ড কেটে তাতে রঙিন কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে মানুষের মূর্তি বানানো যায়।

এতটা পর্যন্ত শুনে আমি এমনই বিচলিত হ'য়ে পড়লাম যে এক পর্যায়ে আবার ভাবতে শুরু করলাম, আদৌ অপারেশান করাব কি না। ডঃ ম্যাকিন্টশ ভুরি ভুরি আশ্বাসবাণীতে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলেন, 'তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? এতটা যে হবেই, তাতো বলিনি। যদি দেখি ক্যান্সার – জীবানু মাত্র চোয়ালের হাড়ের ওপরের অংশে ছুঁয়েছে, তাহলে শুধু সেই টুকু কেটে বাদ দেব। চোয়ালের বাকি অংশটুকু তাহ'লে বজায় থাকবে। তোমার মুখাবয়বও ঠিক থাকবে।'

তাহলে ডাক্তার এত সাতকাহন দুর্বিপাকের কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন? ঢাকার ডাক্তাররা তো রোগীকে কখনো এত কথা আগে থেকে বলেন না? এঁরা এত ভয় দেখান কেন? সবচেয়ে খারাপ কি হ'তে পারে, সেগুলো আগে ভাগেই এত সবিস্তারে কেন বলেন? এর কারণ হয়তো অনেকই থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে সেটা হ'ল ডাক্তারের বিরুদ্ধে রোগীর ম্যালপ্র্যাকটিস স্যুটের (mal practice suit) ভয়েই ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসা পদ্ধতির ভালোমন্দ সব বলে দেন। এদেশে রোগী হরদম ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিচ্ছে এই বলে যে, ডাক্তার আগে থেকে তাকে চিকিৎসা-পদ্ধতির কুফল সম্বন্ধে খোলাসা ক'রে বলেননি। আগে জানলে সে এই চিকিৎসা বা অপারেশান করাত না। মামলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী জিতে যায়। এবং ডাক্তারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তাই প্রত্যেক ডাক্তারই ম্যালপ্র্যাকটিস ইনস্যুরেন্স করিয়ে রাখেন যাতে এরকম মামলায় হেরে গেলে ক্ষতিপূরণের টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে না হয়, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী দিয়ে দেয়। এই ধরণের ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের হার খুব চড়া এবং এই অনুপাতে রোগীর কাছ থেকে নেওয়া ডাক্তারের ফি-য়ের হারও চড়া।

সে সময় ডাক্তারের এত বিশদ ব্যাখ্যায় ভয় পেলেও পরবর্তীতে মনে হয়েছে — ব্যবস্থাটা ভালই। কারণ আগে থেকে সব জানলে রোগী মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারে। ডাক্তাররাও ম্যাল প্র্যাকটিস স্যুটের ভয়ে বেশি বেশি যত্ন নিয়ে থাকেন। বেশি সাবধান হয়ে চিকিৎসা ও অপারেশান করেন।

৩০ জুন দুপুরে সাইনাই হাসপাতাল থেকে একটা ফোন পেলাম। এক মহিলা কন্ঠ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি মিসেস আইমান-য়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

বুঝলাম তিনি মিসেস ইমামকে চাচ্ছেন। এদেশে কেউই ইমামকে ইমাম বলে উচ্চারণ করতে পারে না। এবং শেষের 'ম' টাকেও 'ন' বানিয়ে দেয়। এর কারণ কি, কখনই বুঝতে পারিনি। একটা হ'তে পারে — এরা ইংরেজি আই (I) অক্ষরটিকে বেশিরভাগ সময় 'আই' হিসেবে উচ্চারণ করে, 'ই' হিসেবে নয়।

কিন্তু 'আই' অক্ষর কে 'ই' হিসেবেও তো উচ্চারণ করে, যেমন ইনার (inner) ইনটিরিয়ার (interior) এবং এরকম আরো অনেক শব্দ। তবু কেন যে ইমামকে ইমাম বলে উচ্চারণ করতে পারে না, সে এক রহস্য।

আমি বললাম 'আইমান নয়, ইমাম। আমি মিসেস ইমাম বলছি।'

'আপনি ডাবল বেডেড কেবিনের একটা বেড চেয়েছিলেন। ডাবলবেড কেবিন বর্তমানে খালি নেই। খালি হ'তে দুতিনদিন দেরি হবে।'

না ; দেরি আমি করতে পারব না। হাসপাতালে চারবেডের দুবেডের আর সিঙ্গল বেডের কেবিন আছে। চার বেডেরটায় যাব না ঠিক করেছি। চারজন রোগীর মধ্যে বেশি অস্থির হ'য়ে যাব। ঢাকার হাসপাতালে অপারেশানের অভিজ্ঞতা আমার আছে। অপারেশানের পরে আমি খুব বেশি নেতিয়ে পড়ি।

জিজ্ঞেস করলাম সিঙ্গল-বেডের কেবিন খালি আছে?

'আছে।'

'ভাড়া কতটা বেশি?

'পাঁচ ডলার।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আগে ভেবেছিলাম ভাড়ার তফাৎ অনেকটা হবে। মাত্র পাঁচ ডলার তফাৎ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, তাহলে আমাকে সিঙ্গল কেবিনই দিয়ে দিন। আগামী কালই যেতে চাই।

ডাবল বেডেড কেবিনের দৈনিক ভাড়া ৩৮০ ডলার। সিঙ্গল বেডেরটা ৩৮৫। থাকব মাত্র দশবারোদিন। এমন কিছু বেশি যাবেনা। সিঙ্গল কেবিনের সুবিধে অনেক। বাথরুমটা সম্পূর্ণ আমারই থাকবে। ঘরে ভিজিটারের ভীড় বেশি হবে না। এখানে হাসপাতালে প্রত্যেক কেবিনে টিভি থাকে। বেশ উঁচুতে দেয়ালে ফিট করা, যাতে রোগী তার নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে পারে। সিঙ্গল কেবিন নিলে যখন টিভি দেখতে চাইব না, তখন বন্ধ করে রাখতে পারব।

॥৬॥

মনে বড় অস্থিরতা। ক্যান্সার হ'য়েছে, অপারেশান হ'বে। রোগ বেশিদূর ছড়ায়নি, অপারেশানে ষোল আনা ভাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ঐ যে চোয়ালের হাড় কেটে ফেলতে হ'তে পারে — ওইটাই আমাকে একেবারে ঘায়েল করে দিয়েছে। নাও হ'তে পারে। কিন্তু সেটা তো জানতে পারছি অপারেশানের পরে। তখন যা হবার, তাতো হয়েই যাবে। ইয়া আল্লাহ্। একি আতান্তরের মধ্যে পড়লাম। শরীরের অন্য কত জায়গাতেই তো ক্যান্সার হ'তে পারত। ডাঃ ফখরুজ্জামানের হয়েছিল একটা কিডনীতে।

সেটা ফেলে দিয়ে তিনি গত এগারো বছর ধ'রে দিব্যি বহালতবিয়তে আছেন। আমারো তো কিডনীতে হ'তে পারত। তা না, একেবারে চোয়ালের হাড়ে।

১ জুলাই বিকেল তিনটের সময় হাসপাতালে যেতে হবে। জিনিসপত্র টুকটাক দু একটা যা নেবার তা গোছানো হ'য়ে গেছে এয়ার ব্যাগে। এখন সকাল থেকে ক্রমাগত চিঠি লিখছি। গত একসপ্তাহ ধ'রেই ঢাকায়, লণ্ডনে, কলকাতায় আত্মীয় বন্ধু সবাইকে চিঠি লিখে খবরটা দিচ্ছিলাম। জামী একগাদা এরোগ্রাম এনে দিয়েছে। রোজ ৩/৪ টে করে লিখি। ১২ টার মধ্যে ডাকগাড়ি বাড়ির সামনে আসে। ওটা আসার আগেই চিঠি গেটের পাশের ডাকবাক্সে রেখে দিয়ে আসতে হয়। ডাক পিয়ন আমাদের রাখা চিঠি নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য আসা চিঠি বাক্সে দিয়ে যায়। আজ শেষ সাতখানা লিখলাম। এর আগে লিখেছি বিশখানা। আজকের সাতখানার মধ্যে ভাস্তে কলিম এবং তিনবোনের চিঠিতে আরো অনেকগুলো ফোন নম্বর লিখে বলেছি — ওরা যেন ঐসব নম্বরে ফোন করে ওদেরকে জানায় আমার খবর। কারণ এরপরে আর চিঠি লেখার সময় এবং তাকত আমার থাকবে না।

পয়লা জুলাই ছিল বৃহস্পতিবার। দুটোর সময় জামী ক্রিডার সঙ্গে গাড়িতে চড়লাম। বুক দুরু দুরু করছে বটে, তবে সেই সঙ্গে একটা উত্তেজনাও অনুভব করছি। একটা অজানা নতুন ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কি হবে জানিনা, তার এক ধরণের মাদকতা আছে বই কি।

এ দেশের হাসপাতাল দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন ঝকঝকে তকতকে। রোগীর সংখ্যা কম, নার্স ডাক্তারের সংখ্যা বেশি, ভিজিটারের ভীড় নেই বললেই চলে। তবে প্রতি কেবিনে ফুলের তোড়ার ভীড় বড্ডো বেশি। এদেশে রোগী হাসপাতালে এলে তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব দেখতে আসে বটে তবে দেখতে আসার চেয়ে ফুলের তোড়া পাঠায় বেশি। ফুলের দোকানে গিয়ে রোগীর নাম ও কেবিন নং বলে অর্ডার দিলেই হ'ল, দোকান থেকেই লোকে নির্দিষ্ট কেবিনে ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দেবে। হাসপাতালের নিচতলাতে খাবার রেস্তরা, গিফটশপ ছাড়া ফুলের দোকানও থাকে একটা। ফলে ফুল পাঠানোর কাজটা আরো সহজ হয়। রোগী যতো বেশি অসুস্থ হবে, তার ঘরে ফুলের তোড়ার সংখ্যা ততো বেশি হবে। আমি আমার কেবিনে যাবার পথে কয়েকটা কেবিনের আধ-খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের ফুলের তোড়া দেখতে পেলাম, ফুল ছাড়াও এদেশের রোগীরা আরো একটা জিনিশ উপহার পায় তাদের আত্মীয়বন্ধুর কাছ থেকে। সেটা হ'ল গেট-ওয়েল কার্ড। (Get well card) `রোগীর আরোগ্য কামনার বাণীসহ সুন্দর সুন্দর ছাপানো কার্ড পাওয়া যায় এদেশে। সেগুলিও এসে ভীড় জমায় রোগীর কেবিনে। আমার অপারেশানের বারো দিন পরে আমি যখন বাড়ি ফিরি, তখন দশবারোটা ফুলের তোড়া এবং চোদ্দ পনেরটা গেট-ওয়েল কার্ড সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিলাম। এদেশের ফুলের তোড়াগুলি এমন ভাবে পানি ভর্তি ফুলদানীতে বসিয়ে বিক্রি করা হয় যে, ফুলগুলো কম ক'রে দুতিনসপ্তাহ তাজা থাকে।

যাই হোক, কেবিনে তো এসে পৌছলাম। তার আগে রিসেপসনে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়েছে। সেখানে কতোরকমের ফর্ম পূরণ করা,কতো রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া। আমার

কবজিতে ঘড়ির ব্যাণ্ডের মতো একটা প্লাস্টিকের ব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হল। তাতে আমার নাম এবং আমার ডাক্তারের নাম টাইপ করা।

কেবিনে গিয়ে বসতে না বসতে একের পর এক আসতে লাগল বিভিন্ন ছোট ডাক্তার এবং নার্সরা। এই ছোট ডাক্তাররাও আবার বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের। ডঃ ম্যাকিন্টশের পরে তার সহকারী ডাক্তার, তারপরে ইন্টার্নীশীপ করতে ঢুকেছে এমন কয়েকজন ডাক্তার। তাদের পিছু পিছু আবার একদল শিক্ষার্থী ডাক্তার।

ম্যাকিন্টশের সহকারী ডাক্তারটির নাম এতদিনে ভুলে গিয়েছি, ধরা যাক জন। আমাদের দেশের হাসপাতালে যাকে সি, এ, অর্থাৎ ক্লিনিকাল এসিস্ট্যান্ট বলা হয়, জনের দায়িত্ব সেইরকম। ম্যাকিন্টশের পরেই তার দায়িত্ব।

কেবিনে ঢোকার পর প্রথম এক নার্স। সে এই ওয়ার্ডের হেড নার্স। নাম ভ্যালেরি। ভারি মিষ্টি চেহারা। যদিও দুইগাল বসন্তের দাগের মতো উচুনিচু গর্তে ভরা। কথা আরো মিষ্টি। শুনলে মনে হয় ছোট্ট বাচ্চাকে আদুরে গলায় সোহাগ করছে। ভ্যালেরির সঙ্গে আরেকজন ছোট নার্স ছিল। তার হাতে অনেকগুলো জিনিসপত্র। সেগুলি আমার সামনে নামিয়ে রাখার পর দেখলাম, ঘিয়ে রঙের প্লাস্টিকের গামলা একটা, লিকুইড সাবানের একটা প্লাস্টিক বোতল- - -সাবানটা আবার মেডিকেটেড, ফাইজোহেক্স্ নাম। আমাদের দেশের কার্বোলিক সাবানের মতো আর কি। এ ছাড়াও হ্যান্ড ও বডি লোশনের একটা প্লাস্টিক বোতল, ট্যালকাম পাউডার এক শিশি, শ্যাম্পু ছোট একটা।

দেখে খুব পুলকিত হলাম।

বাঃ, বাঃ, ভারি সুন্দর ব্যবস্থা তো। পেশেন্টের আরামের জন্য কতো কি জিনিসপত্র দিয়েছে, এসব ভাবার মতো মাথাও তাহলে এদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থাপকদের মধ্যে আছে। (কিন্তু এ পুলক বেশিদিন থাকেনি। পরে যখন বিল আসে, দেখতে পাই, প্রত্যেকটি জিনিসের দাম ধরা হয়েছে। প্লাস্টিক গামলাটার দাম ধরা হয়েছে বিশ ডলার। বাজারে সেটার দাম কিছুতেই দশ ডলারের বেশী হবে না।)

ভ্যালেরি আমাকে বলে দিল, আগামীকাল অপারেশানের আগে কি কি করতে হবে। সকালে লিকুইড অ্যান্টি সেপটিক সাবান দিয়ে খুব ভালো করে গোসল করতে হবে, চুলও শ্যাম্পু ক'রে নিতে হবে। অপারেশান হবে কানের লতির নিচ থেকে চোয়াল চিবুকের নিচ দিয়ে পুরো গলাটা বেড়ে —তাই মাথার চুলে কোন ময়লা থাকলে চলবে না। কানের পেছনে ঘাড়ের কাছে কিছুটা চুল সে শেভ করেও দেবে কাল সকালে। নিজেই আসবে এসব করাতে। আজ বলে গেল। শ্যাম্পু ও গোসল করার পর আমার নিজের কোন কাপড় পরা চলবে না। তাদের দেওয়া হস্পিটাল গাউন পরে যেন গোসলখানা থেকে বেরোই।

হসপিটাল গাউন একটা ম্যাক্সির মতো—পায়ের গোছ পর্যন্ত লম্বা- পেছনটা কাটা। পেছনে বাচ্চাদের জামার মতো ফিতে লাগানো। ফিতের ফাঁস দিয়ে গাউনটা পরা থাকে। স্টেরিলাইজ করে ধোয়া একজোড়া গাউনও রেখে গেল ভ্যালেরি।

সে যাওয়ার পর ডঃ জন এল চারপাচ জন ইন্টার্নী ডাক্তারকে নিয়ে। আমেরিকায় বলে রেসিডেন্ট ডাক্তার। এখন একটা রুটিন চেক-আপ। হাতের কবজি ধ'রে পাল্স দেখা থেকে শুরু করে বুকে স্টেথেস্কোপ লাগানো, পেট টিপে দেখা এসব। ডাক্তার এসেই বলে

'তুমি তোমার পোষাক খুলে একটা হস্পিটাল গাউন পরে নাও।' আমি বাথরুমে গিয়ে একটা হসপিটাল গাউন পরে এলাম। ডাক্তার জন বলল, 'তোমার বুকটাও পরীক্ষা করতে হবে। ব্রেস্ট ক্যানসার আছে কিনা দেখা দরকার। গাউনটা খুলতে হবে।'

আমি মনে মনে ভড়কে গেলাম। এই এতগুলো বাচ্চা ডাক্তারের সামনে? এদের মধ্যে দুজনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয়।

পুত্রবধূ ক্রিডা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, ডাক্তাররা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জামী কেবিন থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি ক্রিডার দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকালাম। দেখলাম, ক্রিডার মুখে ভ্রূকুটি। আমি সাহস পেয়ে দৃঢ়গলায় বললাম, 'আমি জানি যে আমার ব্রেস্ট ক্যানসার হয়নি। মুখের ক্যান্সার অপারেশানের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। তার জন্য যা যা পরীক্ষা করতে হয়, করো। বুক পরীক্ষা করার দরকার নেই।'

ডাক্তার জন অবাক হয়ে বলল, 'এগুলো তো রুটিন চেকআপ। করতেই হবে। সবারই করা হয়।'

'হয়তো এদেশে তোমরা সবার করে থাকো। আমি প্রাচ্য দেশের মেয়ে, আমার আপত্তি আছে।'

তখন ডাঃ জন একটু থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

ডাক্তাররা চলে যেতেই ক্রিডা উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠল, ' মা মনি, তুমি ঠিক কাজ করেছ। ওদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ইন্টার্নী ডাক্তার গুলোকে শেখায় তো। তাই একেবারে A থেকে Z পর্যন্ত রুটিন মাফিক করতে চায়। বেশ করেছ তুমি আপত্তি জানিয়ে।'

জামী ক্রিডা আরো খানিকক্ষণ গল্প করে চলে গেল। আগামী কাল সকালে আবার আসবে।

ওরা চলে যাবা. পর আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ ভয়ানক একাকী, নিঃসঙ্গ মনে হ'ল নিজেকে। মুহূর্তেই মন চলে গেল বিশ ত্রিশ বছর আগেকার স্মৃতিতে। বাবা, মা, ভাই বোন, স্বামী, সন্তান- - -সকলের মুখ যেন মনের পর্দার সামনে দিয়ে ভেসে ভেসে গেল। বাবা মারা গেছেন ১৯৬৬ সালে, হার্ট অ্যাটাকে। স্বামী ও জ্যেষ্ঠ সন্তান হারিয়েছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন । মা গেলেন ক্যান্সারে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে। মায়ের ক্যান্সার হবে, এ কথা কেউ অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কারণ মৃত্যুর মাত্র তিনবছর আগে মায়ের গলব্লাডার অপারেশান করা হয়। তখন সার্জন পেটের ভেতর ক্যান্সারের কোনরকম নাম নিশানাও দেখতে পাননি। গলব্লাডার অপারেশানের পর মায়ের স্বাস্থ্যও বেশ ভালো হয়ে যায়। তাহলে মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে মায়ের কোলোনে ক্যান্সার কেন বাসা বাঁধল? ডাক্তাররা বলেন ক্যান্সার কেন হয়, কিসে হয়, এখনো বের করা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁরা অনেকগুলি কারণকে সন্দেহ করেন। তার মধ্যে কয়েকটা হ'ল নিঃসঙ্গতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অসহনীয়, তীব্র শোক ও দুঃখ। (Intense grief and sorrow) তা মা তো জীবনে কম তীব্র শোক পাননি। ১৯৬৪ সালে আমার ভাই চাঁদ মাত্র ত্রিশবছর বয়সে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। সে আমার ছোট ছিল কিন্তু বাবামার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিল। মাত্র দেড়বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল। তখনো কোন ছেলেপিলে

হয়নি। সেই শোক সামলানো বাবা মা দুজনের জন্যই কঠিন হয়েছিল। বাবা তো মারাই গেলেন তার দুবছর পরে, হার্ট অ্যাটাকে। মা বোধহয় আরো দুটো ছোট ছেলের মুখ চেয়ে বেঁচে ছিলেন। ছেলেদুটি অর্থাৎ আমার ভাইদের মধ্যে মেজো মধু এবং ছোট পান্না ঢাকার লেখাপড়া শেষ ক'রে বিলেতে চলে গেল উচ্চশিক্ষার জন্য।

আমার সেজো বোনের স্বামী আজিজ এবং ছোট বোনের স্বামী চিশতী ওরা দুজনেও পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হয়ে গেল।

স্বামীদের সঙ্গে গেল বোনেরা এবং তাদের ছেলে মেয়েরা। ঢাকায় রইলাম আমি এবং আমার মেজোবোন লালু।

মা মানসিকভাবে আমার স্বামী শরীফ এবং বড়ছেলে রুমীর ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সেই শরীফ আর রুমী যখন হারিয়ে গেল যুদ্ধের ডামাডোলে — সেই আঘাত তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। আমিও কি মায়ের পথে চলেছি? মা অপারেশানের পরে আর ভাল হয়ে ওঠেন নি। কলোনের ক্যান্সারের জীবাণু সবটুকু বোধহয় ডাক্তার নির্মূল করতে পারেননি, হয়তো একটা দুটো থেকে গিয়েছিল। অপারেশানের পর দিন দশেকে মা বেশ ভালো হ'য়ে ওঠেন, ছানার পানি, ডাবের পানির লিকুইড ডায়েট পেরিয়ে সরুচালের ভাউভাত, সিং মাছের ঝোল, বাচ্চামুরগীর স্যুপ এসব পর্যন্ত খাওয়া শুরু করেছিলেন। বিছানায় উঠে বসতে পারতেন। কথাবার্তা বলতেন। তখন সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে, আজিজ ও চিশতী তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে পাকিস্তানে আটকা পড়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের পত্রযোগাযোগ হয় লণ্ডনের মাধ্যমে। আমরা লণ্ডনে মধু, পান্নার কাছে তাদের নামে চিঠি পাঠাই। মধু, পান্না সে চিঠি ইসলামাবাদে পোস্ট করে দেয়। দুই বোন বেলু ও ধলু আমাদেরকে চিঠি দেয় লণ্ডনে। সেখান থেকে মধুপান্না আবার সেগুলো ঢাকায় পাঠায়। বেলু আজিজ ও ধলু চিশতীর চিঠি এলে মা খুশি হয়ে ওঠেন, দুতিনবার ক'রে তাঁকে চিঠি গুলো পড়ে শোনাতে হয়। কিন্তু এই ভালো হয়ে ওঠা মাত্র দশ –বারো দিনের জন্য। তারপরেই হঠাৎ একদিন তিনি বমি করলেন। তারপর থেকেই অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। মুখ দিয়ে খাওয়া আবার বন্ধ হ'ল। আবার ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন, আবার দুবেলা ইনজেকশান, আবার অক্সিজেন সিলিন্ডার, আবার বেডপ্যান। মার পেট ফুলতে লাগল, পেটের কাটা জায়গা বরাবর ঘা বেড়ে বিস্তৃত হয়ে গেল। ডাক্তার যখন ড্রেসিং করাতে আসত, মার চিৎকার সহ্য করতে না পেরে দুইকান চেপে আমি ছুটে বেরিয়ে দুতিনটে পরের এক পরিচিত রোগীর কেবিনে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়তাম।

হঠাৎ আমি ধড়মড় ক'রে আমার কেবিনের বিছানায় উঠে বসলাম। এসব কেন ভাবছি এখন? মা,মাগো, তোমার কথা এখন ভাবতে চাইনা বলে তুমি মনে দুঃখ নিয়োনা। এখন আমি দুর্বল হয়ে পড়তে চাইনা। মাগো, যেখানেই থাকো তুমি, আমাকে আশীর্বাদ করো — যেন এই দুর্বিপাক কাটিয়ে উঠতে পারি।

আমি বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম অনেকক্ষণ। তারপর একসময় শান্ত হ'য়ে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম।

খানিকপরে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। সে আমার রক্ত নিতে এসেছে। রক্তের হিমোগ্লোবিন এবং অন্যান্য কি কি সব দেখবে। রক্তের গ্রুপ জেনে রাখবে। দুটো টেস্টটিউব ভর্তি করে অনেখানি রক্ত নিয়ে গেল।

হাসপাতালের নিচের তলায় প্যাথলজি এবং এক্স্‌রে ডিপার্টমেন্ট। সন্ধ্যার সময় হুইলচেয়ারে বসিয়ে নিচতলায় নিয়ে গিয়েছিল কি সব এক্স্‌রে তোলাবার জন্যে। দাঁতের, চোয়ালের এক্স্‌রে তো আগেই ম্যাক্সিলিটিশের চেম্বারে তোলা হয়েছে। এখন বুকেরও এক্স্‌রে তোলা হ'ল। এতসব নাকি প্রয়োজন যেকোন মেজর অপারেশানের আগে।আরো পরে আরেকজন নার্স ঢুকল ঘরে। সে বাতি জ্বেলে আমার শরীরের তাপ পরীক্ষা করল, জিজ্ঞেস করল, ঘুম আসছে? আমি বললাম, 'ঘুম আসা কি সহজ আজ রাতে?' মেয়েটি একটু হাসল, বলল, 'তাহলে একটা ঘুমের ট্যাবলেট দিই। ডাক্তার চার্টে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যদি দরকার হয়, খেতে পার।'

ট্যাবলেট নিয়ে খেলাম। আসলে স্লিপিং পিল নয়। ট্র্যাংকুলাইজার, নার্ভের দাপাদাপি শান্ত করে ঘুম এনে দেবে চোখের পাতায়। অপারেশানের আগের রাতে একটু শান্তিপূর্ণ ঘুম দরকার। তা নইলে অপারেশানের ধকল সইবার শক্তি থাকবে না।

॥৭॥

জ্ঞান ফিরে আসার পর প্রথম যে বিষয়টা টের পাই, তা হল : আমার হাতদুটো দুপাশে কিছু একটার সঙ্গে বাঁধা আছে। বাঁধা আছে বটে, তবে ঢিলে ভাবে। অর্থাৎ হাতদুটো বিঘৎখানেক এদিকওদিক নড়াতে পারি। ঘরটা অবশ্য আলোময়, প্রথম চোখ খুলতেই সব দুলে উঠেছিল। চট করে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। আবার চোখ খুলে তাকালাম। ছাদটা আস্তে দুএকপাক ঘুরে অবশেষে স্থির হ'ল। ডাইনে বাঁয়ে মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। ঘরে কেউ নেই মনে হ'ল। বেডের দুপাশে স্টেইনলেস স্টিল পাইপের খাটো রেলিং দেয়া- - -সেই রেলিংয়ের সাথে চওড়া নরম ফিতে দিয়ে হাতের কবজি বেঁধে রাখা হয়েছে। যাতে হাতটা সামান্য নাড়ানো যায় অথচ মুখের কাছে আনা যায়না। জ্ঞান ফেরার সময় রোগী খুব নড়াচড়া করে। সেই অবস্থায় সে যাতে নাকের অক্সিজেন নল বা হাতের স্যালাইন দেয়া সুঁচ খুলে ফেলতে না পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। এতক্ষণে খেয়াল হ'ল আমার দুই নাকেই নল ঢোকানো—একটা অক্সিজেনের, অন্যটা কি জন্য এতদিনে মনে নেই। বাঁ হাতে কবজি আর কনুইয়ের মাঝামাঝি চওড়া জায়গাটার শিরা ফুঁড়ে ইন্ট্রাভেনাস গ্লুকোজ, স্যালাইন, রক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি দেবার জন্য সুই ঢুকিয়ে রেখেছিল অপারেশান থিয়েটারে নেবার আগেই —সেটা এখন মনে পড়ল। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুই ঢোকানো জায়গাটা টনটন করে উঠল। আর সারা শরীর কেঁপে শীত করে উঠল। কাউকে ডাকতে চাইলাম, গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। মুখের ভেতর অপারেশান হয়েছে, হয়তো সেই কারনেই। ফিতে বাঁধা ডানহাতটা রেলিংয়ের ওপর আছড়ে আছড়ে একটা শব্দ বের করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কয়েকবার ঠক ঠক শব্দ হবার পর কেউ একজন যেন এগিয়ে

এল। কথা বলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। গলা দিয়ে কেবল ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল। একটা হাত আমার হাতের ওপর এসে স্থির হল। লোকটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সব যেন আবছা, ঝাপসা- - -যেন কুয়াশায় ঢাকা। আমি সেই হাতের তালুতে আঙুল দিয়ে লিখলাম, কোল্ড্। (Cold) `স বুঝতে পারল না । আবার লিখলাম। এবারও বুঝল না। শেষে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল একত্র ক'রে লিখবার ভঙ্গি করে বোঝাতে চাইলাম, কাগজ কলম দাও। সত্যি সত্যি কাগজ আঁটা একটা ক্লিপবোর্ড কেউ সামনে ধরল এবং একটা বলপেন আমার হাতে গুঁজে দিল। আমি লিখলাম, আই এম কোল্ড। অর্থাৎ আমার শীত করছে। আমার শরীর একটা কম্বলে ঢাকা ছিল। কেউ একজন আরো কয়েকটা কম্বল এনে গায়ের ওপর বিছিয়ে দিল। এবার জামীর গলা শুনতে পেলাম। 'মা আমি। ক্রিডাও এসেছে।' যেন কুয়াশার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল জামী আর ক্রিডার চেহারা। ক্রিডার দুই চোখে পানি, মুখ ভয়ে উদ্বেগে বিবর্ণ। জামী হাসবার মতো ঠোঁট দুপাশে টেনে মুখটা প্রফুল্ল ক'রে রেখেছে। সে ঝুঁকে বলল, 'সুখবর। তোমার চোয়াল কাটতে হয়নি।' অপারেশানের আগে এইটাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো মাথাব্যাথা ছিল। জামীর মুখে এই কথা শোনার পর আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন মুখের ফোলা কমেছে এবং আমি জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু কথা বলতে পারি, তখন একদিন ক্রিডা বলল অপারেশানের পর জ্ঞান ফিরলে আমি নাকি কাগজে আরো অনেক কথা লিখেছিলাম। লিখেছিলাম : 'অ্যাওক লং এগো নো বডি কেম। এক্স্পিরিয়েন্সিং গ্রেট ইনকনভিনিয়েন্স।' (Awoke long ago. No body came. Experiencing great inconvenience) শুনে আমি তো অবাক। কই, আমার তো মনে নেই। তবে কি সচেতন মনের বাইরে মানুষের মাথা ও হাত কাজ করতে পারে? চোয়ালের হাড় দুটুকরো করে কেটে বাদ দিতে হয়নি, সেই খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে আরো কথা বলতে চেয়েছিলাম? কথা বেরোয়নি, তাই লিখেই জানাতে চেয়েছিলাম অনেক আগে জ্ঞান ফিরেছে, কষ্টের সময় কেউ কাছে ছিলনা?

কোথায় যেন পড়েছিলাম, মনের ক্ষমতা অসীম। কেবল আমরা সেটা জানিনা। আমাদের সচেতন মনের সীমাবদ্ধতার পেছনে একটা দরজা আছে। সেটা বন্ধ। অধিকাংশ মানুষই সারা-জীবনে ঐ বন্ধ দরজা খুলতে পারেনা। তারো বেশিসংখ্যক মানুষ জানেই না যে, দরজা একটা আছে।

১ জুলাই অপারেশানের দিনের রাতটা পোস্টঅপারেটিভ কেয়ার রুমেই ছিলাম। পরদিন সকালে আমাকে কেবিনে নিয়ে আসা হ'ল। মুখ ফোলা, কথা বলতে পারিনা। সেই কাগজ আঁটা ক্লিপবোর্ডও আমার সঙ্গে সঙ্গে কেবিনে এসেছে। যা দরকার, লিখে জানাই।

জামী এলো সকাল দশটার দিকে। ক্রিডা অফিসে গেছে। সে দুপুরের পরে আসবে। জামীর মুখে শুনলাম, গতকাল সকাল এগারোটার দিকে আমাকে কেবিন থেকে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে যাবার পরেও ওরা বাড়ি যায়নি। আমাকে অপারেশান থিয়েটারের দরজার গোড়ায় বিদায় দিল। আমি ভাবলাম ওরা এখন বাড়ি গেল। বিকেলে আবার আসবে। আসলে মনের উদ্বেগে ওরা হাসপাতাল ছেড়ে বেরোতেই পারেনি। একটায় অপারেশান হবার কথা। ডাক্তার বলেছিলেন ঘন্টা চারেক লাগবে। ওরা ভেবেছে বিকেল ৫টা ছটায়

দিকে ডাক্তারের কাছে খবর নিয়ে একেবারে বাড়ি ফিরবে। দুপুরে হাসপাতালের ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেয়ে ওয়েটিং রুমেই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ৫টা ৬টা পেরিয়ে যখন রাত ৮টা নটা বেজে যাচ্ছে তখন ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ওদিকে ডাক্তার ম্যাকিন্টশেরও কোন পাত্তা নেই। ওরা বেজায় ঘাবড়ে যায়। ওরা তখন আর ওয়েটিংরুমেও বসে থাকতে পারেনা। অপারেশান থিয়েটারের দরজার সামনের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত নটার সময় ডাঃ ম্যাকিন্টশ বেরিয়ে এসে ওদের দুজনকে দেখে অবাক হয়ে যান। ওরা সেই সকাল নটা থেকে এই রাত নটা পর্যন্ত বারোঘন্টা হাসপাতালেই অপেক্ষা করছে শুনে দয়াপরবশ হয়ে ওদের দুজনকে পোষ্ট অপারেটিভ কেয়ার রুমে ঢোকবার অনুমতি দেন। নইলে অপারেশানের পর পরই কোন রোগীর কাছে তার কোন আত্মীয়স্বজনকে যেতে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এত দেরী লাগার কারণ সম্বন্ধে ম্যাকিন্টশ জানান, অপারেশান দুপুর একটার পরিবর্তে আড়াইটায় আরম্ভ হয়েছিল এবং পুরো অপারেশানে সাড়ে ছয় ঘন্টা সময় লেগেছে।

আমার জ্ঞান ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায়। আমার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত ওরা দুজনে আমার বেডের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমার সাথে কথা বলে ওদের বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ১২ টা পেরিয়ে গিয়েছিল। আজ কেবিনে শুয়ে শুয়ে জামীর মুখ থেকে এই সব কথা শুনছি, জামীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে একজন নার্স এসে হাজির। বলে 'ওঠো, একটু হাঁটতে হবে।'

শুনে আমার চোখ ছানাবড়া। বলে কি। গতকাল সন্ধ্যায় মাত্র অপারেশান হয়েছে, আর আজ বেলা এগারোটার সময় বলে কিনা - - - হাঁটবার জন্য ওঠো? ব্যাপারটা কি?

আমার কলম ধ'রে কাগজে লেখবারও তর সইল না, ঘাড়-মাথা নেড়ে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানালাম, হাঁটবার ক্ষমতাই নেই আমার।

নার্স খুব ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে বোঝাল, অপারেশানের রোগীদের প্রতিদিন একটু ব্যায়াম করতেই হয়। তাতে দেহের অভ্যন্তরে রক্ত-সঞ্চালনের ক্রিয়া দ্রুত হয়। তারফলে রোগী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। সে আরো বোঝাল এমন কি গুরুতর হার্ট অপারেশানের রোগীদেরও অল্পস্বল্প ব্যায়াম করানো হয়। যারা বিছানা থেকে উঠতে পারেনা, তাদের বিছানায় শুয়ে শুয়েই ব্যায়াম করানো হয়। তোমার তো কেবল মুখে অপারেশান, সারা শরীরের কোথাও কিছু নেই, অতএব তোমার ব্যায়াম হচ্ছে রোজ দুবেলা হাঁটা।

ভালো বিপদে পড়লাম। এইরকম হাঁড়ির মতো কোলা মুখ নিয়ে, হাতে স্যালাইনের সুই নিয়ে এই হসপিটাল গাউন পরা অবস্থায় হাঁটতে হবে? নার্সটি আমার মাথার নিচে হাত দিয়ে আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করল, তারপর একহাতে স্যালাইন স্ট্যাণ্ডটা নিল অন্যহাত দিয়ে আমার একটা হাত ধরে আস্তে আস্তে আমাকে হাঁটিয়ে কেবিনের বাইরে আনল। মাঝারি লম্বা করিডরের দুই পাশে কেবিন। করিডরের শেষ মাথায় দেয়ালে একটা জানালা, সেখান দিয়ে বাইরেটা দেখা যায় - - - সেদিকে একটা বাগান, বাগানের শেষে কতকগুলো বাসাবাড়ি। অনুমান হয় ইনটার্নী ডাক্তারদের। করিডরের অন্যপ্রান্তে নার্সের রিসেপসান কাউন্টার, ক্যান্টিন এবং অন্য ওয়ার্ডে যাবার জন্য আরো করিডর। হাসপাতাল বিল্ডিংটা আমার একটা গোলক ধাঁধার মতো লাগে। এত করিডর, প্রতিটি ওয়ার্ডের মোড়ে

মোড়ে রিসেপসান কাউন্টার, ক্যান্টিন — কোনটা যে কোন ওয়ার্ডের, প্রায়ই গোলমাল হয়ে যায় আমার। রোগীদের সংখ্যানুপাতে নার্সের সংখ্যা আমার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয়। যদিও এদেশেও 'নার্সের সংখ্যা কম' বলে একটা শোরগোল লেগেই থাকে সবসময়। আমার কাছে পর্যাপ্ত মনে হওয়ার কারণ এই যে ঢাকায় অতীতে হাসপাতালে থাকাকালে দেখেছি নিজের কোন আত্মীয় কেবিনে আমার সঙ্গে না থাকলে সুশ্রুষার অভাবে হয়তো বা মরেই যেতাম। এখানে রোগীর সঙ্গে কেবিনে নিজের লোক থাকতে তো দেয়ই না, থাকার প্রয়োজনও হয় না। ঠিক সময়ে নার্স তো আসছেই, চার্টে ডাক্তারের নির্দেশ মতো ওষুধ, পথ্য সব যথাসময়ে দিচ্ছে, তাছাড়াও আমি, মাথার কাছে রাখা কলিংবেলের বেডসুইচ টেপামাত্র ১/২ মিনিটের মধ্যে নার্স এসে হাজির হচ্ছে। নার্সের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হলে এটা সম্ভবপর হতো না। নার্স এসে জোর ক'রে তুলে হাঁটাচ্ছে, নার্স এসে বসিয়ে গা স্পঞ্জ করিয়ে কাপড় বদলে দিচ্ছে— – –বলতে হচ্ছে না, ডেকে আনতে হচ্ছে না। জামী এসে শুধু শুধু বসে থাকে। টিভিতে ফুটবল খেলা দেখে। এখন মেক্সিকোতে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা হচ্ছে।

জামী যে হাসপাতালে এসে রোজ এতক্ষণ বসে থাকে, তার একটা কারণ আছে। অতীতের অভিজ্ঞতার ছাপ ওর মনের অবচেতনে বোধহয় কাজ করে। আমার মা যখন ৭২ সালে ক্যান্সার অপারেশানের জন্য ঢাকার এক হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন মায়ের সঙ্গে আমি এবং জামী দুজনেই কেবিনে ছিলাম, মানে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। মাকে ঠিকসময়ে ওষুধ খাওয়ানো, ইনজেকসান দেওয়ানো, স্যালাইনের বোতল খালি হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা নতুন লাগাতে হবে –এসব ব্যাপারে নার্সদের সর্বদাই ডেকে ডেকে আনতে হ'ত। ডাক্তার যেসব ওষুধ বা ইনজেকসান লিখে দিতেন, সেগুলি বাইরে থেকে কিনে আনতে হ'ত। সে সব আবার সব দোকানে পাওয়াও যেতনা। জামী সারা শহরের সব ওষুধের দোকান খুঁজে খুঁজে কিনে আনত। রাতেও জামী জোর করেই থাকত, যাতে সেও আমার সঙ্গে পালা ক'রে রাত জাগতে পারে। যাতে আমার একলার ওপর বেশি চাপ না পড়ে। তাছাড়া রোগীর পথ্যও বাড়ি থেকে সাবধানে রান্না করিয়ে আনাতে হ'ত, হাসপাতালের খাবার ক্যান্সার –অপারেশনের রোগীর উপযোগী হ'তনা।

এখানে সে সব কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। হাসপাতালের খাবার অত্যুৎকৃষ্ট। যে রোগীর যেরকম দরকার সেরকমই। জামী এসে শুধু শুধু বসে থাকে, গল্প করে, ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা শুরু হ'লে টিভিতে খেলা দেখে।

ফ্রিডাও একটু ঘন ঘনই আসে। এদেশের রোগীদের আত্মীয়স্বজন খুব বেশি হাসপাতালে আসেনা। ডাক্তাররা উৎসাহ দেন না। বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী এরকম নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্যরা ফুল এবং কার্ড পাঠায়। রোগী ভাল হ'য়ে বাড়ি গেলে তারা বাড়িতে যায়, খাবার রান্না ক'রে দিয়ে আসে। কিন্তু ফ্রিডা জামীর কাছে শুনেছে প্রাচ্যদেশীয় লোকেদের সামাজিক আচার –আচরণ। সেখানে অসুখবিসুখ হ'লে বেশি বেশি দেখতে যাওয়াটাই দস্তুর। তাই কি ফ্রিডা এত ঘন ঘন হাসপাতালে আসে? এত বেশিক্ষণ থাকে? না, তা নয়। ফ্রিডার সঙ্গে আমার এই কয়বছরে একটা বিশেষ বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছে। অসম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও, সম্পর্কে শ্বাশুড়ী-পুত্রবধূ হওয়া সত্ত্বেও, আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে

যেতে পারি নানা বিষয় নিয়ে। সে বোঝে এদেশী মানুষের মতো একাকী থাকতে আমি অভ্যস্থ নই। সে এলে, জামী এলে আমি খুশি হই। তাই ভালোবাসার টানে সে অফিস কামাই ক'রে হলেও, এসে অনেকটা সময় কাটায় আমার সঙ্গে।

॥৮॥

একের পর এক ক'রে এগারোটি দিন গড়িয়ে কেটে গেছে। কি অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সেরে উঠছি। প্রথম পাঁচ দিন মনে হয়েছিল এ যাত্রা আর বুঝি বাঁচব না। বিশেষ ক'রে পঞ্চম দিনে হঠাৎ চোয়ালে বিষম ব্যথা শুরু হল। মনে পড়ল আমার মায়ের কথা। অপারেশানের প্রথম ধকল কাটিয়ে উঠে আবার তাঁর অবস্থার অবনতি হয়েছিল। আমার মনে হল, আমারও তাই হয়েছে। মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। জামী ফ্রিডা বুঝিয়ে পারে না। ডাঃ ম্যাকিন্টশের প্রবোধবাণীতেও আশ্বাস মানি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হ'য়ে উঠতে লাগলাম। এবং ভালো হ'য়ে ওঠার গতিটাও এত দ্রুত যে ডাক্তার পর্যন্ত অবাক হয়েছেন। বলেছেন, 'আশ্চর্য তোমার শরীরের নিরাময়ক্ষমতা। একেবারে কিশোরী তরুণীর মতো হিলিং ক্যাপাসিটি। অপূর্ব। চমৎকার।'

আমি বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। ডাক্তার বললেন, 'থাকো না আর দু'একটা দিন।'

না, তা আর থাকতে হয় না। আমার তো ইনস্যুরেন্স নেই সব পয়সা যে নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে। কোন কমপ্লিকেশান তো আর নেই। আই, ভি, ও গত কাল খুলে দেওয়া হয়েছে। আই, ভি, ই যখন নেই, তখন তো বাড়ি যেতেই পারি।

ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ তা পারো।'

অতএব ১২ জুলাই সোমবার সকাল এগারোটায় আমার রিলিজ অর্ডার হ'য়ে গেল হাসপাতাল থেকে। দুপুর ১২ টার আগে রিলিজ হতে পারলে আজকের কেবিন ভাড়া আর লাগবেনা। একটা দিনের ৩৮৫ ডলার বাঁচাতে পারা মানে অনেক খানি বাঁচানো।

ডাক্তার যাবার আগে নানা রকম উপদেশ দিয়ে দিলেন :

• তোমার ডান চোয়ালের হাড়ের ওপরের অর্ধাংশ কেটে ফেলে দিয়েছি, বাকি হাড়টা খুব সরু। সামান্য আঘাতেই ভেঙে যেতে পারে। এমনকি ঘুমের ঘোরে বালিশে বেশি চাপ লাগলেও ভেঙে যেতে পারে। খুব সাবধানে থাকবে। এখনো গলানো খাবারই খাবে। কিছুই চিবোবে না। অ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যথার ওষুধ আরো কয়েকদিন চলবে।

ডক্টর জ্যাক, যিনি আমার লিম্ফ গ্ল্যাণ্ড অপসারণ করেছিলেন, তিনিও কিছু উপদেশ দিলেন : প্রতিদিন ঘাড়ে, গলায় গরম সেঁক দেবে।

দুই ডাক্তারই বলেছিলেন কদিন পরে তাঁদের চেম্বারে গিয়ে দেখাতে হবে।

বাড়ি তো এলাম। এখনো সুপ, জাউভাত, চটকানো কলা এসবই গিলে গিলে খাই- এখনও লিকুইডই খাই।

হাসপাতাল থেকে আসার সময় সবগুলো ফুলের তোড়া, গেট-ওয়েল কার্ড, দেশ থেকে আসা টেলিগ্রামের কপি- - -সব ফ্রিডা যত্ন ক'রে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। অপারেশানের

পরদিন থেকেই টেলিগ্রাম পেতে শুরু করি- - - প্রথমে তিনবোনের তিনখানা, তারপর অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদের। যেমন যেমন টেলিগ্রাম এসেছে, আমী আবার ফিরতি টেলিগ্রামে তাদের জানিয়েছে আমি ভালো আছি। বাড়ি ফেরার পর থেকে সবার কাছ থেকে চিঠিও পেতে শুরু করলাম। কি যে ভালো লাগে এইসব চিঠিপত্র পেতে। সবাই যে কতো ভালবাসে, কতো উদ্বিগ্ন হয়, তা যেন আরেকবার নতুন ক'রে জানা হয়। সেই জানাটা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, ফলে শরীরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে থাকে।

তবুও সাবধানতার অন্ত নেই। রাত্রে ঘুমোনোর আগে দুশ্চিন্তাটা সবচেয়ে বাড়ে। ডান কাতে একেবারেই শুইনা, বাঁ কাতে শুই। কিন্তু ঘুমের ঘোরে যদি ডানদিকে পাশ ফিরি? আমার আবার গালের নিচে করতল রেখে ঘুমোনোর অভ্যেস। যদি হাতের চাপ লেগে ডান চোয়ালের চিকন হাড্ডিটা ভেঙ্গে যায়? ফলে রাতের ঘুমটাও যেন আরামে হতে পারে না।

অপারেশানের একমাস চারদিন পরে ক্যাপসুল গিলতে পারলাম। বাঁদিকের নিচের মাড়িতে পাঁচটা দাঁত মাত্র আছে। ঐটা দিয়ে ভবিষ্যতে চিবোনো যাবে। এখনো জাওভাত জাতীয় জিনিসই খাচ্ছি। আরো একসপ্তাহ পরে ডাঃ ম্যাকিন্টশ বললেন, এখন নরম জিনিস যেমন কেক, কলা, সবজি সেদ্ধ এসব বাঁদিকের দাঁতে যেন চিবিয়ে খাওয়া শুরু করি। তবে শক্ত জিনিস জোর করে যেন না চিবোই। তাতে চিবোনোর চাপে ডানদিকের চোয়ালের হাড় ভেঙে যেতে পারে।

এত সাবধানে থাকি, তবু আগষ্টের শেষ দিকে ডানদিকের চোয়ালে ব্যথা শুরু হ'ল। আমি ভয় পেয়ে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার প্রথমে পাত্তা দিলেন না, বললেন, তোমার তো ওরকম মাঝে মাঝেই ব্যথা হয়। ওটা সাইকোসোমাটিক পেইন।

কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলাম ব্যথাটা আমার অন্যরকম। তবে ডাক্তারকেও দোষ দিই না। অপারেশানের পর এ পর্যন্ত দু'দুবার আমি এই হঠাৎ ব্যথা নিয়ে নিজে ব্যতিব্যস্ত হয়েছি, ডাক্তারকেও ব্যতিব্যস্ত করেছি। দুবারই আমার ভয় হয়েছিল, মায়ের মতো আমারও ক্যান্সারটা রিল্যাপ্স্ করেছে। দুবারই আমার ভয় অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভয়ের মুখে ছাই দিয়ে আমি দিব্যি সেরে উঠছি। কিন্তু এবারের ব্যথাটা অন্যরকম। সামান্য কিছু চিবোতে গেলে, কুল্লি করতে গেলে, জোরে হাসলে বা কথা বললে, ডানদিকের চোয়ালে খচ্‌খচ্ করে ব্যথা করে। আমি ডাক্তারকে আবার ফোন করলাম, আমার চোয়ালের একটা এক্স্‌রে নিয়ে দেখুন হাড্ডি ভেঙ্গেছে কিনা। ডাক্তার বললেন, এত ঘন ঘন এক্স্‌রে নেওয়া ভালো নয়। ফ্রিডারও দেখলাম তাই মত। আরো দুটো দিন গেল। আমার ব্যথা বাড়ছে। শেষে আমি রেগে গেলাম। হাসপাতালে এগারোদিনে তো কমপক্ষে চারবার এক্স্‌রে নেওয়া হয়েছিল। সব রুটিন চেকআপের এক্সরে। আর এখন দরকারের সময় এক্স্‌রে নেওয়া খারাপ হয়ে গেল? আমি ব্যথা সহ্য করতে পারছিনা – ডাক্তারই বলেছে হাড্ডি ভাঙ্গার খুবই সম্ভাবনা। এখন এত ব্যথা হচ্ছে আর তোমরা সবাই চুপ করে আছো? না, আমি চাই যে কালই আমার চোয়ালের এক্স্‌রে করা হোক।

এক্সরে প্লেটে দেখা গেল চোয়ালের হাড় ভেঙ্গেছে।

ডাক্তার ম্যাকিন্টশ খুব স্মার্ট বান্দা। যেন কিছুই হয়নি, এমনি মুখ করে এক্স্‌রে প্লেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে একটা ক্র্যাক দেখা যাচ্ছে। হুঁ – ডেফিনিট ক্র্যাক। তবে চুলের-মত সরু ফাটা। ওটা এমনি এমনিই ক্যালসিফিকেসান হয়ে জোড়া লেগে যাবে। তুমি আবার কয়েকটা দিন লিকুইড খাও। একদম চিবোবে না। তিনসপ্তাহ পরে আবার এক্স্‌রে নেব।'

কি আর বলব। আমার জিভ হলেও রাগটা যেতে চায় না। বেশি এক্স্‌রে করা ভাল নয়, এক্স্‌-রের রশ্মি শরীরের জন্য ক্ষতিকর, এসব কথা এখন বলা হল। অথচ হাসপাতালে এগারোদিনে চার চার বার এক্স্‌রে নেওয়া হয়েছে। আর সে কি কষ্ট। অপারেশানের পরদিনই সন্ধ্যাবেলা এক এক্স্‌রে টেকনিশিয়ান এসে হাজির এক হুইল চেয়ার ঠেলে। আমাকে নিচতলা নিয়ে যাবে এক্স্‌রে করাতে। আমার কেবিন ছয়তলায়। হুইল চেয়ারে বসাল, পাশে স্যালাইনের স্ট্যাণ্ড। এদেশে বলে আই, ভি, অর্থাৎ ইন্ট্রাভেনাস।

এখন গ্রীষ্মকাল বলে পুরো হাসপাতাল সেন্ট্রালি এয়ারকণ্ডিশাণ্ড। এমন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে যে দুতিনটে কম্বল লাগে আমার। আবার হাতে আই ভি সুঁই ফোড়ানো থাকে বলে ভালোকরে কম্বল মুড়ি দেওয়া যায় না। টেকনিশিয়ান হুইলচেয়ার ঠেলে চলল লিফটের দিকে। বিরাট চওড়া লিফট। নেমে একতলায় গেলাম। সেখানে এক্স্‌রে রুম গুলো আরো বেশি ঠাণ্ডা। টেকনিশিয়ান আমার হুইল চেয়ার ঠেলে যেখানে রাখল, দেখলাম আরো তিনচারটে হুইল চেয়ারে রোগী এসে অপেক্ষা করছে। এখানেও লাইন। আমার এক্স্‌রে হতে আধঘন্টা দেরি হল।ততক্ষণে ক্লান্তিতে এবং ঠাণ্ডাতে আধমরা হয়ে গেছি। এমনি ভাবে চারবার এক্স্‌রে করিয়েছে আমাকে চারবার ঠেলা-চেয়ারে বসিয়ে সেই হিমপুরীতে নিয়ে গিয়ে। আর এখন বলে কিনা বেশি এক্স্‌রে ভালো নয়? ওদিকে চোয়াল ভেঙ্গে বসে আছে।

কপাল ভাল, ভাঙ্গা চোয়াল বেশি ভোগাল না। চোয়াল ভাঙ্গলেও স্থানচ্যুত হয়নি, সাবধান থাকার ফলে আস্তে আস্তে ভাঙ্গা জায়গাটায় ক্যালসিয়াম জমে জমে জোড়া লেগে গেল। তিনসপ্তাহ পরে এক্স্‌রে নিয়ে দেখা গেল, জোড়া লাগা জায়গাটা মোটা হয়ে আছে। দুটো ভাঙ্গা রডকে যেন সিমেন্ট দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়েছে। ক্যালসিয়াম জমে ঐ রকম হয়েছে।

ভাঙ্গা চোয়াল তো জোড়া লাগল কিন্তু ভাঙ্গা মন যে জোড়া লাগছেনা। যতদিন মুখ ফোলা ছিল, ততদিন ঠিক এ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। মুখের ফোলাটোলা সব কমে যেতে আয়নায় মুখ দেখে বুক ভেঙ্গে গেল। একি চেহারা হয়েছে আমার। ডানকানের লতির নিচ থেকে চোয়ালের নিচ বরাবর থুতনি বেড়ে বাঁ কানের লতির নিচ পর্যন্ত কেটে ফাঁক করে বাঁ দিকের নিচের ৫টা দাঁত বাদে নিচের মাড়ির সব দাঁত ফেলে দিয়ে, সবটা মাড়ি কেটে ফেলে দিয়ে, চোয়ালের হাড়ের ওপরের অংশ কেটে বাদ দিয়ে তারপর আবার সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। যেন গরু জবাই করে আবার জোড়া দেওয়া হয়েছে। ডান কষ্ঠা বরাবর আবার কেটে ডানদিকের লিম্ফ্‌ গ্ল্যান্ডগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কাটাকুটির পরে যেভাবে সেলাই দেওয়া হয়েছে তাতে থুতনির নিচে খানিকটা চামড়া কুঁচকে

গুটলি মেরে রয়েছে। কিশোরী মেয়ে প্রথম সেলাই মেশিনে জামা সেলাই করতে বসলে আনাড়ি হাতে যেমন জামার কাপড় কুঁচকে ফেলে, আমার থুতনির নিচের চামড়াটা তেমনি দেখায়। এই দুই ডাক্তার — ডাঃ ম্যাকিন্টশ আর ডাঃ জ্যাক - - - দুইজনে মিলে সাড়ে ছয়ঘন্টা ধরে এত যত্ন, আর পরিশ্রম করে কাজটা কেমন করল, দেখ দেখি। তারপর ঠোঁটের ডানকোনাটাও একটু বসে গেছে। ওখানটায় কোন সাড় নেই। ডাক্তার অবশ্য আগেই বলেছিলেন। অপারেশানের ফলে অনেক ছোট ছোট নার্ভ কাটা পড়বে, কানের লতি, ঠোঁট, গলা, কাঁধ, সব জায়গায় বহুদিন কোন সাড় থাকবেনা। তবে ছমাস থেকে দু বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে ৮০% সাড় ফিরে আসবে। তা এই অসাড়তা নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। সাড় তো একসময় ফিরে আসবেই। কিন্তু চেহারাটা একি হয়ে গেছে।

আমার চেহারার সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলাম আমি। লোকে আমাকে সুন্দর বলত। কিন্তু লোকের প্রশংসা সত্ত্বেও মনে অবিশ্বাস থেকে যেত - - - ওরা যতটা বলে ততটা আমি নই। তবে আমার হাসির প্রশংসাটা মেনে নিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে আমার গ্রীবার সৌন্দর্যের। শুধু যেদুটো জিনিসের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল, সেই দুটো জিনিসের ওপরই ক্যান্সারের থাবা পড়েছে। আমার সেই অনবদ্য হাসি আর থাকল না। থাকলনা সেই মরাল গ্রীবার সৌকুমার্য। এই সৌন্দর্য হানির দুঃখটা আমাকে এতটাই অভিভূত করে দিল যে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল, পরিচিত জন কারো মুখোমুখি হব না কাউকে দেখাব না এই মুখ। যে কোন বড় দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি বা যেকোন অসুখে চেহারার বিকৃতি মানুষকে এভাবেই বিক্ষিপ্ত-চিত্ত করে দেয়। যুদ্ধ বা দুর্ঘটনায় হাত পা বা চোখ হারানো পুরুষ, দুর্ঘটনা বা অসুখে বিকৃত চেহারার নারী - - - সবার বেলাতেই এই চিত্ত-বিক্ষিপ্ততা ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় পরিণত হয়। মনের ভেতরে নানাধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। এথেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় অবশ্যই আছে, তবে তা কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ।

মনে পড়ল ১৯৬১ সালে আমার শ্বশুর গ্লুকোমারোগে অন্ধ হ'য়ে যান। তখন তাঁর বয়স সত্তরের ওপরে। অন্ধ হবার পর তাঁর যে কি সাংঘাতিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। অন্ধত্বকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক হ'তে তাঁর প্রায় তিনচার বছর লেগেছিল। যদিও পুরোপুরি প্রশান্ত তিনি কখনই হ'তে পারেন নি। বেশ চুপচাপ থাকতেন। হঠাৎ মাঝে মাঝে মানসিক বিক্ষিপ্ততায় অস্থির হ'য়ে উঠতেন। আমারও কি তাই হবে নাকি? আমিও কি মানসিক রোগী হয়ে যাব? আমাকে কি শেষ পর্যন্ত মনস্তত্ত্ববিদের কাছে যেতে হবে?

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ভেতরে ভেতরে যত কষ্টই হোক, বাইরে প্রশান্ত থাকবার চেষ্টা করব। আর কখনই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাব না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেই কি তা রাখা যায়? ওয়াশিংটন ডিসিতে থাকে মাসুমা, চাম্মু, স্বপন, কল্পনা। মাসুমা আমার ছোটবোনের মতো, তার স্বামী চাম্মুও খুব আদরের। ওরা সব সময় ফোন করে খবর নিয়েছে। গেট-ওয়েল কার্ড পাঠিয়ে ফুল পাঠিয়ে উৎফুল্ল করেছে। এদেশে এই এক সুবিধে। ওয়াশিংটন ডিসির ফুলের দোকানে ফোন করে অর্ডার দিলে তারা তাদের মিশিগানের শাখাদোকানে ফোন করে নির্দিষ্ট বাড়িতে ফুলের তোড়া

পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করতে পারে। সেই চাম্মু একদিন ফোন ক'রে বলল 'বুবু আমরা তোমাকে দেখতে যাব।' শুনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমি বলে উঠলাম, 'না, না, তোমাদের আসতে হবে না। আমার যা চেহারা হয়েছে, কারো আর দেখতে আসার দরকার নেই।'

চাম্মু স্নিগ্ধস্বরে বলল, 'বুবু, আমরা যখন তোমার দিকে তাকাই তখন কি তোমার চেহারা দেখি? না, চেহারা দেখিনা। আমরা 'তোমাকে' দেখি।'

চাম্মুর গভীর গমগমে কণ্ঠস্বরের কথাকয়টি আমার মনে এক অনাবিল শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। আমার ভেতরে আক্ষেপ ও অশান্তি অনেক কমে গেল।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লেবার-ডে-র ছুটিতে মাসুমারা মিশিগানে এল আমাকে দেখতে। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে মিশিগানের ওয়েস্টব্লুমফিল্ডে আসতে গাড়িতে চোদ্দঘন্টা লাগে। ওরা এত পথকষ্ট সয়ে আমাকে দেখতে এল। কটা দিন ওদের সান্নিধ্যে খুব আনন্দে কাটল।

কিন্তু মনের ভেতরের আক্ষেপ আর অশান্তি একেবারে মরে না। ফ্রিডা জামী থেকে শুরু করে শামু, জো, মাদু, ডাই, ফ্রিডার বাবা-মা গাস ও শীলা — সবাই বলছে তোমার চেহারা ঠিকই আছে, মোটেই খারাপ দেখাচ্ছে না — তবু মনে সান্ত্বনা নেই। ক্যানাডার টরোন্টোয় আমার মেজভাই (আমার ছোট, ভাইদের মধ্যে মেজো) মধু সপরিবারে বাস করে। আমি যখনই মিশিগান আসি, মধুর ওখানে একবার বেড়িয়ে আসি। ওয়েস্ট ব্লুমফিল্ড থেকে গাড়িতে ৪—৫ ঘন্টার রাস্তা। ডেট্রয়েট দিয়ে যেতে হয়। সেখানে নদীর নিচে টানেল দিয়ে গিয়ে ক্যানাডার সীমানায় উইন্ডসরে উঠতে হয়। যাতায়াত করা খুব সোজা।

এক উইকয়েণ্ডে গেলাম সেখানে জামী ও ফ্রিডা সহ। প্রতিবার আমরা গেলে মধু একটা বড় ক'রে পার্টি দেয় বাড়িতে। টরোন্টোতে অনেক বাঙালি বাস করে। মধুর বন্ধু সার্কেলও বেশ বড়। বাড়িতে পার্টি ছাড়াও মধু মীনা আমাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যায় অনেক জায়গায়। ওদের অনেক বাঙালি বন্ধু দাওয়াত করে আমাদেরকে।

এবার টরোন্টো গিয়েই আমি মধু ও তার বউ মীনাকে বললাম, এবার আমি কোথাও, কারো বাড়িতে বেড়াতে যাব না। আর তোমরাও বাড়িতে কাউকে ডাকতে পারবে না। কাউকে জানাবেই না যে আমরা এসেছি।

মধু মীনা আমার মনের অবস্থা বুঝে আমার কথায় রাজি হ'ল। আমি ছুটির সারাটা সময় ওদের বাড়িতে কাটালাম, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব ক'রে, ওদের বাচ্চাদের আদর ক'রে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে বিচলিত হ'য়ে উঠলাম। আমি ঢাকা থেকে এসেছি এক্স্‌কারসান টিকেট কেটে। এর মেয়াদ চারমাস। নিয়ম হ'ল ১২০ দিনের মধ্যে ঢাকা ফিরতে হবে। না হ'লে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে। এদিকে ডা : ম্যাকিন্টশ তো বলছেন একবছরের আগে তিনি আমাকে ফিরতেই দেবেন না। অপারেশান করে ক্যান্সার জীবানু যদিও নির্মূল করেছেন, তবুও বেশ কিছুদিন আমাকে পর্যবেক্ষণে রাখতে চান নতুন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় কি না তা দেখার জন্য। যে কারণে মুখের

ভেতরে ডানদিকে ক্যান্সার হয়েছিল, সেই একই কারণে শরীরের অন্য জায়গায়ও তো হতে পারে।

তাহ'লে তো টিকেটের মেয়াদ বাড়াতে হয়। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অফিসে জামী কোন ক'রে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। ওরা জানাল ডাক্তারের একটা সার্টিফিকেট দিতে, তাহলে টিকেটের মেয়াদ বাড়িয়ে দেবে, অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে না।

তাই করা হ'ল, ডঃ ম্যাকিন্টশ একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিলেন। তাতে তিনি আমার ক্যান্সার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করলেন অন্তত আরো একবছর আমার এদেশে থাকা দরকার।

সেই সার্টিফিকেটের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ আমার টিকেটের মেয়াদ একবছর বাড়িয়ে দিল। জেনে খুব নিশ্চিত বোধ করলাম। কিন্তু এদিকে যে আমার দিন কাটে না। আমি ক্রমাগত ভালো হ'য়ে উঠছি। অপারেশানের পরে চিকিৎসা করার আর কিছু নেই, রেডিয়োথেরাপী না, কোন ওষুধ না, ইনজেকসান না, কিছুই আর দরকার নেই। অপারেশান এমন নিখুঁত ভাবে সফল হয়েছে যে মুখগহ্বরের মধ্যে কোথাও আর একটিও ক্যান্সার-সেল নেই। ডাক্তার বলেন, আপনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। তারপর একটু হেসে বলেন, অবশ্য শরীরের অন্য জায়গায় হ'লে আমার দোষ নেই।

এখন শুধু মাল্টি-ভিটামিন খাই, আর কোন ক্যাপসুল নয়। মোটামুটি সব ধরণের খাবারই বাঁদিকের পাঁচটা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেতে পারি। তবে খুব সাবধানে চিবোই। ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়?

আমি ডাঃ ম্যাকিন্টশকে বোঝাতে শুরু করলাম : আমার যখন শরীরে আর কোন ক্যান্সার – সেল নেই এবং কোন বিশেষ ওষুধপত্রও খেতে হচ্ছে না, তখন আমাকে দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হোক। ডাক্তার কিছুতেই রাজি নন। আমি রেগে গিয়ে জামীকে বললাম, 'ডাক্তারের অনুমতির দরকার নেই। চল এয়ারওয়েজ অফিসে। টিকেটে তারিখ বসিয়ে আনি।'

জামীর সঙ্গে গেলাম ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অফিসে। যার নামে টিকেট তাকে ওরা যেতে বলে অফিসে। না গেলে টিকেটে তারিখ দেয় না। যথাসময়ে গিয়ে আমার টিকেটখানা এগিয়ে দিলাম কাউন্টারের ওপরে। ভদ্রমহিলা টিকেটটা পাতা উল্টিয়ে দেখে কম্পিউটারের বোতাম টিপে কি কি যেন সব দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন 'আপনাকে তো এখন ডেট দেওয়া যাবে না।'

আমি হতভম্ব হ'য়ে বললাম 'কেন, কেন, আমার টিকেট তো ভ্যালিড। ডঃ ম্যাকিন্টশের সার্টিফিকেট দিয়ে সময় বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।'

'সেই জন্যই ডেট দেওয়া যাবে না। ডাক্তার বলেছেন আরো একবছর আপনাকে এখানে থাকতে হবে। তারমানে সামনের বছরের আগষ্ট পর্যন্ত। এখন তো মোটে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ।'

আমি হতাশমুখে জামীর দিকে তাকালাম। জামী মুখটা নির্বিকার বানিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ইচ্ছে আমি ডাক্তারের কথামতো বছর খানেক থেকেই যাই ওদের সঙ্গে।

এয়ারওয়েজ-য়ের মহিলাটি আমার মুখ দেখে বোধকরি মনের ভাব আঁচ করতে পারলেন। সদয় কণ্ঠে বললেন, ডাক্তার যদি আপনাকে এখন দেশে ফেরার অনুমতি দেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আর একটা চিঠি নিয়ে আসুন, তখন আপনাকে একটা ডেট দিতে পারব।

বাড়ি ফিরে আমি কান্নাকাটি শুরু করলাম। জামী ফ্রিডাকে বললাম, যে ক'রেই হোক ডাঃ ম্যাকিন্টশের পারমিশন নিয়ে দিতেই হবে। কারণ ডাক্তার অনুমতি না দিলে তো জোর ক'রে যাবার উপায় নেই। এ তো হেঁটে কিংবা রিকশায় চড়ে এলিফ্যান্ট রোড থেকে নয়াপল্টন বা হাটখোলা যাওয়া নয় যে আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে রেগে বেরিয়ে যাব। জামী ফ্রিডা বুঝেই পায় না, কেন এখানে আমার মন টিকছেনা। ওদের কি ক'রে বোঝাব এত সুন্দর, পরিস্কার, ছবির মতো দেশে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখানে কোলাহল নেই, বাচ্চা কাচ্চার চেঁচামেচি নেই, রাস্তায় ভীড় নেই, গলিতে ফেরিওয়ালার হাঁক নেই, দরজায় ফকিরের ঘ্যানর ঘ্যানর নেই। এখানকার পড়শীরা যখন-তখন হুট করে বিনা টেলিফোনে এসে পড়ে না, পথ হাঁটতে গেলে প্রতিপদে রিকসা এসে পথরোধ করে না। ঢাকার বাড়ির চারপাশে পাড়ার বাচ্চাদের ছোটাছুটি চিল্লাচিল্লির জ্বালায় কোনদিন দুপুরে ঘুমোতে পারিনি, অসময়ে মেহমান আসার জ্বালায় কতোদিন কতো কাজ বাকি থেকেছে, ফেরিওয়ালা আর ফকিরের হাঁকের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি ; এখন ওই জ্বালাগুলিই আমাকে চুম্বকের মতো টানছে। ওই গুলির অভাবে এখানে এই শান্তিময়, সৌন্দর্যময়, সভ্য ভদ্র জগতে আমার প্রাণ খাবি খাচ্ছে। এখন আরো ভালো করে বুঝছি, ব্রুকলীনের ঘিঞ্জি পাড়ার ছেলে নীল ডায়মণ্ড কেন গেয়েছিল, 'বিউটিফুল নয়েজ, কামিং আপ্ দ্য স্ট্রীট।' নীল ডায়মণ্ডের মতো আমারো দরকার সুন্দর কোলাহল। মনোমুগ্ধকর হৈ চৈ। তার অভাবে আমার এই দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী আর কাটে না।

ফ্রিডা বুঝতে না পারলেও জামী একরকম করে বুঝল যে আমার দেশে ফিরে যাবার জন্য মন বড়ই উতলা হয়ে উঠেছে। সে ডাঃ ম্যাকিন্টশকে বুঝিয়ে রাজি করাল। তিনি বৃটিশ এয়ার ওয়েজকে আবার একটা চিঠি দিলেন এই মর্মে যে আমি এখন দেশে ফিরে যেতে পারি। সেই চিঠি নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বি, এ, অফিসে গিয়ে টিকেটে ডেট বসিয়ে নিয়ে এলাম। ১০ অক্টোবর ডেট্রয়েট এয়ারপোর্ট থেকে লণ্ডন রওনা দেব। ১১ তারিখের সকালে লণ্ডন পৌছে ঐদিনই কানেকটিং ফ্লাইট ধরে ঢাকা পৌছোব ১২ তারিখের বিকেলে।

॥৯॥

'সীটবেল্ট বাঁধুন' নির্দেশটি জ্বলে উঠেছে। আর খানিকক্ষণ পরেই প্লেন ঢাকার মাটি স্পর্শ করবে। বুকের ভেতরে কতোরকম আবেগ যে উথাল পাথাল করছে। যে আমি

পাঁচমাস আগে এই ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই আমি আজ ফিরছিনা। এ এক অন্য আমি। পাঁচমাস আগে ঢাকায় ও লণ্ডনে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবার ফেরার পথে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়াটা কতোই তফাৎ। লণ্ডনে দুই ফ্লাইটের মাঝখানে চোদ্দ ঘন্টার বিরতি ছিল, সেই সময়টা লিণ্ডা স্বপনের বাড়িতে কাটিয়েছিলাম ওরা এয়ারপোর্টে এসে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। পাশা ফ্রাংফুট থেকে লণ্ডনে এসেছিল। বিকেলে সিরাজ, মেরু এসেছিল দেখা করতে। সমস্ত ব্যাপারটা খুবই অন্যরকম লাগছিল আমার কাছে। আমি সেই আমিই আছি, কারো বুবু, কারো খালা — কিন্তু সেই আগের আমি আর নেই। সবাই কতো আদর, ভালোবাসা আর আর্তি চোখে মেখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, বারে বারে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, তবু কেন নিজেকে এমন বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে ?

লণ্ডনের অভিজ্ঞতার এখানেও পুনরাবৃত্তি হবে না কি ? জানি এয়ারপোর্টে অনেকেই আসবে—আমার বোনেরা, তাদের স্বামী ছেলেমেয়েরা, আমার ভাস্তে, ভাস্তে-বৌ, নাতি-নাতনি, যারা আমাকে 'আম্মা' বলে ডাকে, আমার সেইসব ছেলে-মেয়েরা। আমি কেমন করে তাদের মুখোমুখি হবো ? তারাই বা কি ভাবে আমার সামনাসামনি হবে ?

ভেতরটা কান্নায় ভেঙে গেলেও মুখে হাসি বজায় রেখেই সবার সাথে কোলাকুলি করলাম। ওদেরও সবার মুখে হাসি, চোখে পানি। আমি যে নিরাময় হয়ে ফিরে এসেছি, এতেই ওরা এত খুশি যে তারপর আর কোনকিছু গণ্য করার দরকার নেই। আমার চেহারার বিকৃতি নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা নেই। চেহারা তো ঠিকই আছে। যত মাথাব্যথা সব তো আমার নিজের মনের জটিল গলি-ঘুঁজিতে।

পাঁচমাস পরে ঢাকায় ফিরে খুব ভাল লাগছে। কিছুটা শারীরিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন ডান হাতটা তুলে মাথার ওপরে নিতে পারি না। টান পড়ে। মাথা ডানদিকে ও পেছনে ঘোরাতে পারি না। এটা হয়েছে গলা ও ঘাড়ের ডানদিকের অংশ থেকে ডাঃ জ্যাক ১৯টা লিম্ফগ্ল্যাণ্ড কেটে বাদ দিয়েছেন বলে। ফলে জায়গাটা দেবে গেছে, সেলাই দেবার পর চামড়াও কিছুটা খেপে গেছে। হাত তুললে বা ঘাড় ঘোরালে টান লাগে। ডাঃ জ্যাক অবশ্য কতকগুলো ব্যায়াম বলে দিয়েছেন, রোজ করতে হবে। তাতে কয়েকমাস পরে ক্রমশঃ টানটা কমে আসবে। এখানে আসার পর প্রথমেই যে অসুবিধা হয়েছে, তাহল গাড়ি চালাতে পারছিনা। আমার ড্রাইভার নেই, নিজেই গাড়ি চালাই। এখন কিছুদিন এর ওর ড্রাইভার ধার করে কাজ চালাচ্ছি। অবশ্য বোনেদের গাড়ি আছে। চাইবার আগেই বলে রেখেছে যখন দরকার নিয়ো। কিন্তু পাঁচমাস গ্যারাজে বসে থেকে আমার গাড়িটার অবস্থা শোচনীয়। মেকানিক দিয়ে নিরাময় করিয়ে নিতে হয়েছে। এখন তাকে চালু রাখার জন্যই রাস্তায় বের করা দরকার।

নিজে ড্রাইভ করার তীব্র নেশায় ডানহাতের সীমাবদ্ধতা বেশিদিন সহ্য করলাম না। কয়েকদিন পরেই একদিন সাহস করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম খুব একটা বেশি অসুবিধে হচ্ছে না। ডানায় টান পড়ছে একটু। কিন্তু ব্যথা করছেনা। উৎফুল্ল হয়ে ভাবলাম এটা এক ধরনের ব্যায়ামের কাজ করবে।

নিজে গাড়ি চালাতে পেরে মনের ভার অনেকটা কমে গেল।

তবু দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক কাজকর্মে কিছুটা অসুবিধে হয় বৈকি। গোসল করতে, চুল মুছতে, চুল আঁচড়ে খোঁপা করতে ডানায় বেশ টান লাগে। আগের সেই কর্মশক্তিও আর নেই। গাড়ি চালাতে পারলেও আগের মতো অনায়াস নৈপুণ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে গাড়ি ব্যাক করতে পারিনা। অনেকক্ষণ ধরে চালাতে পারি না। ফলে আগে যেমন 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা' ভাবটা ছিল, সেটা আর থাকছে না। একে-ওকে কতোজনকে গাড়িতে তুলে চর্কির মতো ঘোরা, আড্ডা দেওয়া, সিনেমা নাটকে যাওয়া সে সব আর চালাতে পারছিনা। ফলে বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তা থেকে অন্য ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা গেল। এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করল গাজী শাহাবুদ্দিন — সচিত্র সন্ধানীর সম্পাদক। সে একদিন একটা বই হাতে করে এসে বলল, 'খালাম্মা, এখন তো বেশি বাইরে যেতে পারেননা, বসে বসে এই বইটা অনুবাদ করুন। প্রতিসপ্তাহে সন্ধানীতে ছাপা হবে।' হাতে নিয়ে দেখলাম, বইটার নাম 'ডালাস।' তখন টি,ভিতে 'ডালাস' খুব জনপ্রিয় সিরিয়াল। এই বইটা একটা পকেটবুক সংস্করণ। এতে 'ডালাস' টিভি সিরিয়ালটির প্রথম কুড়িটি পর্ব লিখিত আকারে রয়েছে।

নেই কাজ তো খই ভাজ। এরকম একটা হালকা কাজ পেয়ে আমি খুশি হলাম। অনুবাদ করতে লাগলাম। এরমধ্যে একদিন মেরিয়ান-য়ের সঙ্গে দেখা। মেরিয়ান ব্রিটিশ মেয়ে। ৮০ সালে কি একটা প্রজেক্ট নিয়ে বাংলাদেশে এসে আমার বাড়িতেই পেয়িং গেস্ট হিসেবে ছিল মাস তিন-চার। তারপর ফিরে গিয়েছিল। এবছর আবার এসেছে অন্য কি একটা প্রজেক্ট করতে। আছে অন্য জায়গায়। এবার সে বেশিদিন থাকবে। বলল, বাংলা শিখতে চাই। তুমি শেখাও না আমায়।

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আরেকটা কাজ পাওয়া গেল। অবশ্যই শেখাব। আমার তো এখন বাড়ি বসে করার মতো এই ধরনের কাজই দরকার।'

মেরিয়ান বলল, 'আমার এক ফরাসী বান্ধবী আছে, সেও শিখতে চায়।'

'বেশ তো দুজনেই একসঙ্গে শিখতে এসো।'

মেরিয়ানের বান্ধবীর নাম জান। না, আমাদের দেশী আদরের ডাক 'জান' নয়, ওর নামের 'জ' য়ের উচ্চারণ 'জ' আর 'ঝ' য়ের মাঝামাঝি। যাই হোক, ঠিক হ'ল সপ্তাহে দুদিন করে শিখতে আসবে। আমার বহুবছর আগে থেকেই দুএকজন ক'রে বিদেশীকে বাংলা শেখানোর অভিজ্ঞতা ছিল, প্রয়োজনীয় বইপত্রও ছিল।

একদিন বিকেলে পড়াচ্ছি। এমন সময় গাজী এল ডালাসের কপি নিতে। আমার ছাত্রী দুজনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। সে কৌতূহলী হয়ে খানিকক্ষণ বসে বসে দেখল, তারপর বলল, 'আপনি বিদেশীদের বাংলা শেখানোর জন্য একটা বই লিখুন না।'

আমি বললাম, 'মাঝে মাঝে ভেবেছি যে লিখি। কিন্তু উদ্যমের অভাবে হয়ে ওঠে না।'

গাজী এবছর অক্টোবরে ফ্র্যাংকফুর্ট বইমেলায় গিয়েছিল। সেখানে অনেক দেশ থেকে প্রকাশকরা নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে বইয়ের স্টল দিয়েছিলেন। গাজীও সন্ধানীর স্টল দিয়েছিল একটা। সেখানে লণ্ডন প্রবাসী এক ভারতীয় প্রকাশক তাকে বাংলাদেশ থেকে বিদেশীদের বাংলা শেখার কিছু বই লণ্ডনে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। সেই কথাটা মনে করে গাজী আমাকে একটা বই লেখার কথা বলল। আমি এতেও খুব উৎসাহিত বোধ করলাম।

মেরিয়ান ও জানকে পড়াতে পড়াতে আমি বাংলা শেখার বইটারও পাণ্ডুলিপি তৈরী করা শুরু করলাম।

দেশে ফেরার পর এই কাজগুলো শুরু করাতে আমার মানসিক বিপর্যয়টা রোধ করা গেল।

এই ভাবে দিন গড়িয়ে যায়। বোনেরা, বোনেদের স্বামী ছেলেমেয়েরা, যারা আমাকে 'আম্মা' বলে ডাকে, সেইসব ছেলেমেয়েরা, আমার ভাস্তে, ভাস্তে বউ, তাদের ছেলেমেয়েরা, দেবর, ননদ, ভাগ্নে ভাগ্নী — সবাই সবসময় আসছে, যাচ্ছে, খোঁজ খবর নিচ্ছে, খাবার রান্না করে দিয়ে যাচ্ছে — কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, হেলাফেলা নেই, আগের মতোই সবার বাড়িতে দাওয়াত পাচ্ছি, খাচ্ছি। হাসি গল্প-আড্ডা হ'চ্ছে। তবু কেন জানি হঠাৎ হঠাৎ প্রাণের মধ্যে দুঃখের বলক্ ওঠে। তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কারো মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। এইরকম জটিল মানসিক বিপর্যয়ের সময় আমার নীরব সঙ্গী হয় শামীম আজাদ কিংবা শাহরিয়ার কবির কিংবা শাহ্‌দত চৌধুরী। ওরা অনেক সান্ত্বনার বাণী শোনায়, আমাকে ঘিরে অনেকটা সময় কাটায়। ওরা ওদের কথা এবং আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চায় — আমাকে ওদের প্রয়োজন। আমি নিজের জন্য আর বাঁচতে না চাইলেও এখন ওদের জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার বোনেরাও তাই বলে, 'আম্মা, মা কেউ বেঁচে নেই, দুই ভাই বিদেশে। বুবু তুমি ছাড়া আমাদের আর কে মুরুব্বি আছে ?'

এতে তখনকার মতো প্রাণে শান্তির একটা প্রলেপ পড়ে বটে। ডিপ্রেশান কাটিয়ে উঠি। লেখালেখিতে মনোযোগী হই।

||১০||

ডাঃ ম্যাকিন্টশকে কথা দিয়েছিলাম, ৮৩ সালের গ্রীষ্মকালে আবার মিশিগান আসব। সেই কড়ারেই তিনি ৮২ সালের অক্টোবরে দেশে ফেরার অনুমতি দিয়েছিলেন। ৮৩ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আবার আকাশে উড়লাম। মনটা এবার বেশ ভাল। আমার লেখা বিদেশীদের বাংলা শেখানোর বইটা An Introduction to Bengali Language — বেরিয়েছে। সঙ্গে কিছু কপি নিয়েছি। গান্ধীর অনুরোধে তার পরিচিত সেই লণ্ডনবাসী প্রকাশককে কিছু বই পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকটা বই নিয়েছি আমার বিদেশিনী বন্ধুমাতা ফ্রিডা এবং বিদেশিনী দুই ভ্রাতৃবধূ জোসেফিন ও ডায়ানার জন্য। মিশিগান যাবার পথে এবার দুইজায়গায় থামলাম। আমার সব ছোট ভাই পাশা থাকে ফ্রাংকফুর্টে। গতবার তার ওখানে যাওয়া হয়নি। এবার প্রথমে ওখানে থামলাম। তারপর লণ্ডনে।

মিশিগানে ডাঃ ম্যাকিন্টশ আমার মুখের ভেতরটা পরীক্ষা করে বারবার সন্তোষ প্রকাশ করলেন, খুব চমৎকার ভাবে সব সেরে গেছে। ক্যান্সার অপারেশানের পর এত সুন্দর নিরাময় খুব কম দেখেছি। ঘাড়, গলা, মাড়ি — সব ভাল করে টিপে-টুপে পরীক্ষা করে রায় দিলেন, তুমি পুরোপুরি সুস্থ।

পুরোপুরি সুস্থ। আ-হ, কি আনন্দের সংবাদ।

মিশিগানে থাকলাম তিনমাস। জামী-ফ্রিডার সাথে বেড়ালাম বেশ কয়েকজায়গায়। টরোন্টোতে গেলাম মধু মীনার কাছে। শিকাগোতে গেলাম বান্ধবী লিজল খানের বাসায়। শামু-জোর সঙ্গে ট্রাভার্স সিটিতে গেলাম। শেকসপীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখতে গেলাম তিনশো মাইল দূরে স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে । এটা আবার ক্যানাডা রাজ্যে। এখানে প্রতিবছর গ্রীষ্ম ও হেমন্তে শেকসপীয়ারের নাটকের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফ্রিডার কাছে উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী আসে। সে সূচী দেখে কোন একটা তারিখের জন্য টিকেট চেয়ে চেক পাঠায় ডাকে। টিকেটও এসে যায় ডাকেই। গতবছরই প্রথম গিয়েছিলাম আমি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। ততদিনে শরীর অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে। খুব সকালে রওনা হয়ে চার সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে স্ট্র্যাটফোর্ড পৌছে গিয়েছিলাম। সঙ্গে লাঞ্চ, চা, পানি, ফল এসব নিয়েছিলাম। ওখানে তিনটে থিয়েটার হল আছে। থিয়েটার হলগুলো ঘিরে বিরাট জায়গা - - - ফুলের বাগান, কৃত্রিম নহর। মাঝে মাঝে খাবার জন্য টেবিল বেঞ্চ পাতা পার্ক। আমরা পৌছে প্রথমে পার্কে একটা টেবিল বেছে খাবার নিয়ে খেতে বসে যাই। চারদিকের মানুষের তৈরী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে লাঞ্চ খাওয়া সারি। দুপুর দুটোর সময় শুরু হয় ম্যাটিনী শো। আমরা সবসময় ম্যাটিনী শোর টিকেটই নিই। কারণ আমরা ঐদিনই রাতে ফিরে আসি। যারা ওখানে থাকতে চায়, তাদের জন্য হোটেল, মোটেল তো আছেই, আরো আছে তাঁবু ভাড়া করে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত্রি যাপনের রোমাঞ্চকর ব্যবস্থা।

এবারও আমরা গেলাম একদিনের জন্যই। রাতে ফিরে আসব। গত বছর আমরা ফেস্টিভাল হলে নাটক দেখেছিলাম। এবছর টিকেট কেটেছি এভোন হলের । একেক বছর একেকটা হলে নাটক দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈচিত্রের আমেজ আছে।

গতবারের মতো এবারও লাঞ্চ, চা, পানি, ফল এসব গাড়িতে তুলে রওনা দিলাম বেশ সকালেই। গতবারের পার্কেই এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেলাম ধীরেসুস্থে। ম্যাটিনী শুরু হবে দুপুর দুটোয় । আমরা দেখব 'লাভস্ লেবারস্ লস্ট' নাটক শেষ হতে আমরা গেলাম 'জেস্টার আর্মস' নামের রেস্তরাটায়, ডিনার সেরে নিতে। তিনঘন্টার নাটক শেষ হতে ৫টা বেজে যায়। আর এদেশে তো ডিনার টাইম শুরু হয় ৫টা থেকেই। 'জেস্টার আর্মস'য়ে প্রচণ্ড ভীড় হয়। নাটকের কুশীলবরা সাধারণতঃ এই রেস্তরাঁতেই আসেন ডিনার খেতে। তবে তাদের মেকআপ তুলে, পোশাক বদলে আসতে আসতে একটু দেরিই হয়। তার আগেই এসে ঢুকতে পারলে টেবিল পাওয়া যায়। নইলে অনেকক্ষণ 'অপেক্ষায়' দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

গত বছর এ তথ্য জানা ছিল না বলে নাটক ভাঙলে চারদিকে ঘুরেফিরে দেখে তার পর এখানে ঢুকেছিলাম। এবারে আর সে ভুল করলাম না। হল থেকে বেরিয়েই গাড়িতে উঠে সোজা 'জেস্টার আর্মস'-য়ে। টেবিলও পেয়ে গেলাম মনোমত। রেস্তরাঁটি সাজানো দুশোবছর আগের ইয়োরোপীয় স্টাইলে। আমেরিকায় এই প্রবণতা সর্বত্র। সব জায়গাতেই দুচারটে রেস্তরাঁ পাওয়া যাবে পুরনো কালের স্টাইলে সাজানো।

এই রেস্তরাঁর কয়েকটি খাবারও পুরনো কালের রেসিপি অনুযায়ী তৈরী করা হয়। তার একটা হ'ল ফিশ্ পাই। (Fish pie) মাছ কাঁটাশুণ্য করে পিষে মজাদার মসলার সঙ্গে মিশিয়ে সেটা একটা বাটিতে ময়দার লুচি বিছিয়ে তার ওপর ঢেলে আরেকটা লুচি দিয়ে ঢেকে কিনারাগুলো আঙ্গুল দিয়ে চেপে মুড়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ বাটিটা আভন-য়ে দিয়ে বেক করা হয়। অতি সুস্বাদু এই ফিশ পাই। গতবছরই ফ্রিডা বলেছিল এই ডিশটা আমার খেতে সুবিধে হবে। খেয়ে এত মজা লেগেছিল যে এবছরও আমি ঐ ডিশটাই অর্ডার দিলাম।

আমাদের খাবার আসতে আসতে লক্ষ্য করলাম, রেস্তরাঁর টেবিল গুলো ক্রমশঃ ভরে উঠছে। গল্প গুজব হাসির উচ্চকলরোলে নিজেদের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব ভাল লাগছিল। গতবারের চেয়েও এবার যেন বেশি উপভোগ করলাম এই কারণে যে, আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত।

দেশে ফিরে এলাম ১ নভেম্বর। ঢাকার সবাই শুনে খুব খুশি । আমারও মনে হ'ল জীবনের নতুন মেয়াদ পেয়েছি। ২৫ নভেম্বর সকালে দাঁত ব্রাশ করার পর আঙ্গুল দিয়ে মাড়ি ম্যাসাজ করার সময় হঠাৎ মনে হল বাঁদিকের ভেতরের মাড়িতে একটু খানি উঁচুমতো কি যেন আঙ্গুলে ঠেকল। আবার ভালো করে আঙ্গুল ঠেকালাম। তারপর হাত আয়না নিয়ে বারান্দায় এসে বেশি আলোতে দেখার চেষ্টা করলাম। তেমন বিশেষ কিছুই নয়, সেই দুবছর আগের মতো সাদাটে ফাঙ্গাস জাতীয় খসখসে একটুখানি ঘা। ঘরে এসে হাত আয়নাটা রেখে প্রথমে ঘন্টা দুই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে আয়নায় আমার প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে। জাহানারা ইমাম, তুমি মাত্র ২৫ দিন আগে ডাক্তারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়ের সার্টিফিকেট নিয়ে দেশে ফিরে এসেছ। আর ২৫ দিনের মধ্যেই এই ব্যাপার?

সারাদিন ভাবলাম। সারারাত নির্ঘুম ভাবলাম। পরদিন সকালে শাহাদত চৌধুরীকে ফোন করলাম, বললাম ব্যাপারটা। সে শুনে বলল, 'আম্মা, আমি আসছি আপনার বাসায় একটু পরে।'

এগারোটায় শাহাদত এল। বলল প্রথম কাজ হবে এখানকার একজন দন্তচিকিৎসককে দেখানো। দ্বিতীয় কাজ হবে জামীকে সব লিখে চিঠি দেওয়া। জামী ডাঃ ম্যাকিন্টশকে সব বলে জেনে নেবে তাঁর মতামত। শাহাদত তার জানা এক দন্তচিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেল আমাকে পরদিন। তিনি দেখেশুনে বললেন, 'এক্ষুনি কিছু বলা যাবে না। প্রথমে এককোর্স অ্যান্টি বায়োটিক দিই। খেয়ে দেখুন কমে কিনা।'

অ্যান্টি বায়োটিক শুরু করলাম সন্ধ্যা থেকেই। জামীকে চিঠি পোষ্ট করলাম। তারপর আবার নতুন ক'রে ভাবতে বসলাম।

এই যেটার সূচনা হ'য়েছে এটা যদি ক্যান্সারই হয়, তাহলে আমি কি করব? আবার মিশিগান যাব চিকিৎসা করাতে? সেটা সম্ভব নয় অর্থ নৈতিক কারণে। আমার হেলথ ইনস্যুরেন্স নেই। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমেরিকায় হেলথ ইনস্যুরেন্স করানোর ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে। গতবারের চিকিৎসার খরচ সম্পূর্ণ বহন করতে হয়েছে

নিজেদেরকেই। তার জন্য জামীর বাবার যা স্থাবর সম্পত্তি ছিল গ্রামের বাড়িতে, তা থেকে অনেকটা বিক্রি করে এই দেনা শোধ করতে হ'য়েছে।

এখন তাহ'লে কি করব? আবার আমেরিকায় চিকিৎসা করাতে যাওয়া মানে আবারো নিজের গাঁট থেকে খরচ করা। তারমানে জামীর বাবার বাকি সব-সম্পত্তি সব বিক্রি ক'রে দেওয়া। জামীকে নিঃস্ব করে দেওয়া।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাব না। এখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাব। ঢাকায় ডাঃ তালুকদার নামে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তাঁকে লোকে 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী' বলেন। এমনই তাঁর হাত—যশ। আমি আগেও তাঁর ওষুধ খেয়েছি মাঝে-মধ্যে, মাথা ধরার জন্য, সর্দি-জ্বর-কাশির জন্য। খুব ভাল ফল পেয়েছি।

ডাঃ তালুকদার আমার ছোট বোনের স্বামী চিশতীর বিশেষ পরিচিত। সেই সুবাধে আমার সঙ্গে ওদের সামাজিক পর্যায়ে মেলামেশা রয়েছে। ডাঃ তালুকদারকে ফোন ক'রে বাসায় ডাকলাম।উনি একদিন সস্ত্রীক এলেন বেড়াতে। ওঁকে সব খুলে বললাম। উনি জোর দিয়ে বললেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অবশ্যই ক্যান্সারের ওষুধে আছে। এবং এ ওষুধে ক্যান্সার ভালও হয়।

ওঁর কথায় মনে খুব ভরসা পেলাম। দুতিন দিন পর একদিন ওঁর চেম্বারে গেলাম। উনি পূর্বাপর রোগের ইতিহাস বিস্তারিত শুনে তারপর ওষুধ দিতে শুরু করলেন।

১৯৮৪ সালে মাড়ির অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেলনা। অর্থাৎ ঐ যে একটুখানি সাদাটে ফাঙ্গাস মতো কি যেন আঙ্গুলে ঠেকত, ওটা ওইরকমই রয়ে গেল, বাড়ল না। তাতে মনে হ'ল হোমিওপ্যাথিক ওষুধে কাজ হচ্ছে। ফাঙ্গাসমতো জিনিসটা অদৃশ্য হয়ে গেল না বটে কিন্তু মনে জোর এল। ১৯৮৪ সালের মে মাস থেকে অদ্ভুত এক পেটের ব্যাথা শুরু হ'ল। চব্বিশ ঘন্টাই ব্যথা, একমুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই। ডাঃ তালুকদার ওষুধের পর ওষুধ বদলে হয়রান হ'য়ে গেলেন, ব্যথা কমেও না, থামেও না। তখন বেরিয়াম মিল এক্স্-রে, আল্ট্রা সোনোগ্রাম ইত্যাদি নানারকম টেস্ট শুরু করা হ'ল পিজি হাসপাতালে, কোথাও কিছুই ধরা পড়ল না। সবই নর্মাল, কোথাও তো কোন কিছু নেই। তাহ'লে? ডাঃ আজাদ — আরো কতো কতো ডাক্তার যে দেখলেন আমায় তার ইয়ত্তা রইলনা। আমার ছেলেরা - - - আলম, আখতার, শাহ্‌দত একেক জন একেক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় কোন কিছুতে কিছু হয় না। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই মনে করলেন আমার শেষ অবস্থা। সবাই দেখতে আসা শুরু করলেন। যে আত্মীয় তিনবছর ধ'রে আসেননি, তিনিও একদিন এসে হাজির। এসব দেখে নিজেই ঘাবড়ে গেলাম, কি রে বাবা। ক্যান্সার নয়, শেষ পর্যন্ত এই পেটের ব্যাথাতেই যেতে হবে নাকি?

ডাঃ জি, এম, চৌধুরীর কাছে যখন যাই, তিনি মন্তব্য করেছিলেন এটা আলসার ছাড়া আর কিছু নয়। দেড় থেকে দুমাস পরে আপনিই ভাল হ'য়ে যাবে। কোন গুরুপাক খাবার খাবেন না, শুধু সেদ্ধ খাবেন। আর বারে বারে খাবেন।'

ডাক্তারের কথাই ফললো শেষ পর্যন্ত। দেড়মাস পর থেকে ব্যথা একটু একটু কমতে থাকল। এই সময়ের আরেকটা বিপদ — কাজের কোন বাঁধা মানুষ ছিল না। একটা ঠিকে

মেয়ে — জরিনা, সে সকালের দিকে এসে ঘন্টা দুই তিন থাকে। সব কাজ সেরে তারপর চলে যায়। বাকি সময়টা আমি একা। নিচতলায় থাকে ভাস্তে কলিম। তার বউ সেলিনা এবং মেয়ে রিমাই বাকি সময় যতটা পারে, দেখে। বাইরে থেকে আসে দুই বোন বেলু, ধলু, তাদের মেয়েরা, আসে শামীম আজাদ। বোনেদের, শামীমের শতকাজ, তার মধ্যেও ওরা এসে এসে দেখাশোনা করে যায়। শামীমই একটা সর্বক্ষণের বাঁধা কাজের মেয়ে কোথেকে যেন খুঁজে পেতে নিয়ে এল। তাতে আরেকটু আরাম হ'ল। তার নামটি আবার বেশ কাব্যময় — ডালিয়া।

আস্তে আস্তে ব্যথা কমতে কমতে একদিন পুরোপুরিই অদৃশ্য হ'ল। ইতিমধ্যে আড়াই মাস কেটে গেছে। এখনও যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না যে ব্যথাটা নেই। এত বেশি দিন, সর্বক্ষণ, চব্বিশঘন্টা ব্যথাটা ছিল যে, এখনও যেন মনে হয় — সে আছে। সকৌতুকে ভাবি, ব্যথাটাকে মিস করছি না কি?

ব্যথার চোটে লেখালেখি সব শিকেয় উঠেছিল। ওর মধ্যেই শাহ্‌দত চাপাচাপি করছিল, 'আম্মা একটা কিছু লেখার চেষ্টা করুন। ঈদসংখ্যা বিচিত্রার জন্য একটা উপন্যাস লিখুন।

তার উপরোধে উপন্যাস একটা লিখতে শুরু করেছিলাম কিন্তু ঈদসংখ্যায় ধরাতে পারলাম না। তেমন বড়ও করতে পারলাম না। ঈদসংখ্যার পরবর্তী ঈদ আনন্দ সংখ্যায় সেটি গেল।

গণপ্রকাশনী থেকে বীরশ্রেষ্ঠ বই লেখার অনুরোধও শাহ্‌দতই নিয়ে আসে। ব্যথার জন্য এতদিন লেখা হয়ে ওঠেনি। আগামী বছরের বইমেলায় যাতে বইটা প্রকাশিত হ'তে পারে তারজন্য অক্টোবর থেকেই একটু একটু কাজ শুরু করে দিলাম। বইটি লেখার জন্য কিছু গবেষণা করার এবং বেশ কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেগুলিই প্রথমে শুরু করলাম।

ব্যথা নেই এবং মুখের ভেতরে বাঁদিকের মাড়িতেও কোন পরিবর্তন নেই। মনে হচ্ছে ক্যান্সারটা শেষ পর্যন্ত আর আক্রমণ করতে পারল না। মন বেশ ফুরফুরে, লেখালেখি, গাড়ি দাবড়িয়ে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি বেড়ানো, আড্ডা, পার্টি, নাটকদেখা — সব কাজই চলতে লাগল সমান তালে।

শাহরিয়ার কবির অনেকদিন থেকে বলছিল 'আম্মা আপনি আপনার ছোটবেলাকার কথা লিখুন।' আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, 'ধুস্, আমি কি এমন বিখ্যাত হয়েছি যে আত্মজীবনী লিখব।'

'আত্মজীবনী কি কেবল বিখ্যাত লোকেরাই লেখে? আত্মজীবনী তো আসলে একটা যুগেরই প্রতিচ্ছবি – যে যুগে সেই মানুষটি বাস করে। আপনার ছোট বেলা মানে সে-ই ত্রিশের দশক, চল্লিশের দশক। আপনার নিজের কথা লেখা মানে সেই যুগের চালচিত্রটা উঠে আসা। সেটার ঐতিহাসিক মূল্য কতটা, তা ভেবে দেখেছেন কি?'

শাহরিয়ারের কথায় পাত্তা না দিলেও প্রেরণাটা বোধহয় ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। একদিন আনোয়ারা সৈয়দ হকের বাসায় দুপুরে খেলাম। সেদিন তার বান্ধবী দিল-রওশনও ছিল। সবাই খুব মজা করলাম সারা দুপুর। ফিরে আসার আগে বললাম, 'তাহলে সামনের সপ্তাহে আমার বাড়িতে তোমরা এসে খাবে।' আনোয়ারা বলল, 'শুধু

খাওয়া দাওয়া করলেই হবে না। আপনি এর মধ্যে একটা কিছু লিখবেন। আমরা সেদিন দুপুরে ওটি শুনব।'

হঠাৎ প্রচণ্ড উৎসাহ বোধ করলাম মনের মধ্যে। শাহরিয়ারের কথাটা মনে পড়ল। ভাবলাম ছোটবেলার স্মৃতিকথাই তাহলে লিখি। এইরকম দুদিক থেকে প্রেরণা না পেলে এধরণের লেখা এত তাড়াতাড়ি শুরু করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'তনা।

আনোয়ারা ও দিল রওশন যেদিন দুপুরে খেতে এলো, সেদিন তাদের পড়ে শোনালাম বিশ –পঁচিশ পৃষ্ঠার একটা লেখা। এত তাড়াতাড়ি তো আর পুরো একটা বই লিখে শেষ করা যায় না। কিন্তু শুরুটা ওইভাবেই হয়েছিল। শাহরিয়ারের প্রেরণা ভেতরে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, আনোয়ারার ধাক্কায় সেটি দপদপিয়ে উঠল, যাহোক কোন একভাবে শুরু করে দিলাম। মাস দুই তিনের মধ্যে অনেকটা লিখে ফেললাম। প্রথম খণ্ডের ছেদ টানলাম আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় পর্যন্ত। বইটার নাম দেওয়া হ'ল 'অন্যজীবন।' শাহরিয়ারের বন্ধু চিত্রশিল্পী কাজী হাসান হাবিব বইয়ের প্রচ্ছদ করবে। 'ডানা প্রকাশনী' থেকে বইটা ছাপা হবে, স্থির হ'ল।

ডিসেম্বরের তিন তারিখে গাজী আমার বাসায় এসে বলল, 'আপনার একটা ডায়রী আছে না একাত্তর সালের? ১লা থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুটো লেখা লিখে দিন না দিনলিপির আকারে। সন্ধানীতে দুই সংখ্যায় ছাপব।'

হ্যাঁ একাত্তর সালের লেখা ডায়রীটা এখনো আছে আমার কাছে। মাঝে মাঝে ভেবেছি, রুমীর কথা লিখব। কিন্তু লিখবার আগে পুরো ডায়রীটা একবার পড়ে নিতে গিয়ে শোকে দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছি। লেখা আর হয়ে ওঠেনি। এখন, এবছরে হঠাৎ মনের মধ্যে লেখার জোয়ার এসেছে। তাই গাজীর প্রস্তাবটা লুফে নিলাম। সচিত্র সন্ধানীর একটা সংখ্যা বেরোবে ৯ ডিসেম্বর, পরবর্তী সংখ্যা ১৬ ডিসেম্বর। আজ ৩ ডিসেম্বর।

৬ তারিখের মধ্যে কপি দিতে হবে। পারব তো? পারলাম। কারণ দুটো। এক, মনের মধ্যে অফুরন্ত উদ্যম। দুই, গত একমাস থেকে একটা বড়গল্প লিখবার চেষ্টা করছিলাম একাত্তরের ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়ে। বিজয় দিবসের বিশেষ সংখ্যা কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেবার জন্য। কিন্তু আধাআধি লেখার পর আর এগোয়নি। ওটার নাম দিয়েছিলাম চোদ্দদিন। ওইটে খানিকটা লেখা ছিল বলে এখন, সচিত্র সন্ধানীর জন্য দিনলিপি আকারে লেখাটা শেষ করা সহজ হ'ল।

॥১১॥

মনের মধ্যে অপার আনন্দ। মুখের ভেতরে মাড়ির বাঁদিকে কোন জটিলতা নেই। ডাঃ তালুকদারের ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি প্রতিসপ্তাহে। সেই ফাঙ্গাস মতো সাদাটে জিনিসটা মাড়ির গায়ে লেগে আছে বটে, তবে ওটাকে আর কোন ভয় নেই। শরীরও এমনিতে যথেষ্ট ভালো রয়েছে। এ বারের বইমেলায় আমার দুটো বই বেরোচ্ছে ' বীর শ্রেষ্ঠ' আর 'অন্য জীবন'। দুটোরই প্রুফ দেখার কাজে ডিসেম্বর –জানুয়ারী দুটো মাস বেশ ব্যস্ত ছিলাম। 'বীরশ্রেষ্ঠ' অফসেটে ছাপা হচ্ছে। তার পেন্টিংয়ের সময়ও আমি থেকেছি শাহাদত আর আলীর

সঙ্গে। খুব মজা লেগেছে পেন্টিং করতে। কতো ভুল যে বেরোয় শেষমুহূর্তেও —তখন চেয়ে চেয়ে দেখি আলী কেমন ধারালো ব্লেডের কোনা দিয়ে ভুলটুকু চেঁছে ফেলে সেখানে অতি চিকন তুলির আগা দিয়ে শুদ্ধ অক্ষর বা টানগুলো মেরামত করে দেয়।

জামী মিশিগান থেকে আসছে ১৮ফেব্রুয়ারী। ততদিনে আশা করি বইদুটো বইমেলায় চলে আসবে। বই বের করার এই শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়ো আর নির্ঘুম একটানা পরিশ্রম যে কি জিনিস, যে এর মধ্যে দিয়ে না গিয়েছে, সে বুঝবে না। কিন্তু এত পরিশ্রমের মধ্যে নেশাও আছে একটা প্রচণ্ড। ভালোলাগার নেশায় কোন কষ্টই গায়ে লাগে না।

আরো একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে। ডিসেম্বরের দুই সংখ্যা সচিত্র সন্ধানীতে আমার ডায়রী অবলম্বনে লেখা স্মৃতি কথা পাঠকমহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অনেক পাঠকের ফোন — আমিও পেয়েছি, গাজীও পয়েছে। তাতে করে গাজী আর চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী দুজনেই আমাকে বলেছেন, একাত্তরের পুরো নয়মাসের স্মৃতিকথা লিখতে। সচিত্র সন্ধানীতে ওঁরা ধারাবাহিক প্রকাশ করবেন।

স্থির হয়েছে ১মার্চ থেকে শুরু করব। জামী আসবে ফেব্রুয়ারীতে। সে ঢাকায় থাকা অবস্থায় তার সঙ্গে যাতে বেশি সময় কাটাতে পারি, তার জন্য জানুয়ারীতেই দু'তিন সংখ্যার লেখা লিখে ফেলেছি। যত ঘটনা ঘটেছিল প্রতিদিন পয়লা মার্চ থেকে, সে সবের তারিখ, সময় ও স্থান ডায়রীর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্য মাঝেমাঝেই ন্যাশনাল আর্কাইভে গিয়ে একাত্তর সালের পুরনো খবর কাগজ পড়েছি এবং নোট নিয়েছি। এই সব রকম কাজে দিনও যেমন তরতর করে কাটছে, মনও তেমনি ফুরফুরে হ'য়ে রয়েছে।

জামী ১৮ফেব্রুয়ারী এসে তিন সপ্তাহ ঢাকায় বেড়িয়ে গেল। সময়টা চমৎকার কাটল। আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ি প্রতিদিন দুপুরে লাঞ্চ ও বিকেলে টি-পার্টি, রাতে ডিনার, তার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা একাডেমীর বই মেলাতে বেড়ানো। আরো অনেক জায়গায় বেড়ানো। এবার ফ্রিডা আসতে পারেনি জামীর সাথে। সে তার অফিস থেকে ছুটি পায়নি। জামী প্রথমে বলেছিল তাহলে সেও আসবে না এবছর। দুজন একসঙ্গে সামনের বছর আসবে। কিন্তু ফ্রিডা তাকে বলে, 'না তুমি একাই যাও। তোমার মা অপেক্ষা করে আছেন। আমি বরং সামনের বছর একা যাব ঢাকা'।

জামী চলে গেল ১১মার্চ। সে চলে যাবার পর আমি পুরোটা সময় নিয়ে 'একাত্তরের দিনগুলি' লেখায় নিমগ্ন হয়ে গেলাম। কিন্তু পুরোপুরি নিমগ্ন হ'তে চাইলেই কি সব সময় তা পারা যায়? যায় না যে, তার প্রমান মাত্র দশ দিন পরেই হঠাৎ কোমরে ভীষণ ব্যথা পেলাম। আমার নিজের দোষেই। আমার ছাদে কিছু ফুলের টব আছে। রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা এবং আরো কয়েকরকম। কিছু পাতাবাহারও আছে হরেকরঙের। কিছু চির হরিৎ। কয়েকটা ক'রে টব আমার বসার ঘরে এনে রাখি। রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা —এগুলো ফুটলে ঘরে এনে রাখি। রোদ না পেলে এসব গাছ ঠিক থাকেনা। তাই সাতদিনের বেশী কোন টব ঘরে রাখিনা। প্রতি সাতদিন পরপর টব বদলে দিই। এই বদলানোর সুবিধের জন্যই আমি রজনীগন্ধার টব করেছি ২৫টা। চন্দ্রমল্লিকার ১০টা। গাঁদা দশটা —এমনি ভাবে অন্য গাছের টবও তিনটে চারটে ক'রে আছে। সেদিন সকালে শাহ্যদত এসেছে। বসে বসে কথা বলছি আর মাঝে মাঝে উঠে টুকটাক দুয়েকটা ঘরের

কাজ করছি। কাজের মেয়ে দশদিনের ছুটিতে দেশে গেছে। এখনো ফেরেনি। শাহ্যদতের সাথে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ একটা ভারী ফুলের টব দুহাতে উঠিয়ে আরেক পাশে সরিয়ে দিলাম। টবটা যেখানে ছিল, আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল সেখানে ওটা মানাচ্ছে না, অন্যখানে সরিয়ে দিলে ভাল দেখাবে। আমি টবটা তোলা মাত্রই শাহ্যদত হাঁ হাঁ ক'রে উঠল, ' আম্মা, কি করলেন? আমাকে বললেই তো হ'ত। নিজে তুলতে গেলেন কেন? কোমরে ব্যথা আছে না আপনার? দেখবেন, এখন কি হয় ।'

কোমরে ব্যথা আমার একটা আছে — সেই ৬৩ সাল থেকে। সামনে ঝোঁকা, ভারী জিনিস তোলা — এসবই আমার বারণ। তবু মনে থাকেনা। মাঝে মাঝে মনের ভুলে একটা কিছু তুলে ফেলি। কাউকে ডেকে করিয়ে নেবার মতো ধৈর্য থাকেনা।

শাহ্যদতের কথাই ফলল। পরদিন থেকেই কোমরে বেশ ব্যথা শুরু হ'ল। যথারীতি ব্যথার ওষুধ খাই, গরম সেক দিই আর লেখালেখির কাজ করে যাই। বাইরে ঘোরাফেরাও তেমন বন্ধ করি না। এতে ব্যথাটা কিন্তু পুরোপুরি সেরে যাবার সুযোগ পেলনা। ডাক্তার বলেছিলেন, একদম চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে থাকবেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ভেতরে প্রচণ্ড অস্থিরতা। তার ওপর ছোট একটা কাজের মেয়ে নিয়ে বাড়িতে একা থাকি। নিঃসঙ্গতার ক্রুর থাবা এড়ানোর জন্যই আমার যত ছোটাছুটি। বাড়িতেও হরদম লোকজনের আনাগোনাকে উৎসাহিত করি। ফলে যাকেবলে কমপ্লিট বেড রেস্ট সেটা আর হ'য়ে ওঠে না।

পহেলা বৈশাখ সকালে ঘুম ভেঙে দেখি কোমরের ব্যথা প্রচণ্ড —নড়তে পর্যন্ত পারছি না। একটু ভয় পেয়ে গেলাম। ডাক্তার এসে প্রচণ্ড রাগারাগি করলেন। এই ডাঃ এ, কে, খান আমার স্বামীর স্কুলজীবনের বন্ধু এবং গত পঁচিশ বছর ধরে আমার প্রতিবেশী।আমার বিপদ -আপদ, আনন্দ -উৎসব, হাসি-কান্না সব কিছুর সঙ্গেই ইনি এবং পুরো পরিবার জড়িত। ডাক্তার কড়া নির্দেশ দিলেন বিছানা ছেড়ে একদম উঠতে বেন না। কেবল বাথরুম যাবার সময়টুকু ছাড়া। খাওয়া-দাওয়াও শুয়ে শুয়ে করতে ।

ভাগ্য ভালো, কাজের মেয়ে নীলু ছুটি উপভোগ করে ফিরে এসেছে। তাই ডাক্তারের শি এবার অক্ষরে অক্ষরে পালন করা গেল। অতিথি মেহমান এলেও বেডরুমে এসেই করে। নীলু ছোট হ'লেও খুব কাজের মেয়ে। সে সদর দরজা খোলা থেকে শুরু করে মানদের খাতিরযত্ন করা, আমার সেবাশুশ্রূষা, রাঁধাবাড়া, বাড়ি ঝাড়ামোছা, কাপড় কাচি — সব কাজই একাহাতে সামলাচ্ছে।

বই তো হ'চ্ছে, কিন্তু শুয়ে শুয়ে লেখা যে ভারি কঠিন কাজ। লিখি বলপয়েন্ট কলমে, বোর্ডে কাগজ সেঁটে চিৎহয়ে লিখতে গেলে কলম উল্টো হয়ে যায় তাতে কলমের নিচে নেমে যায় ফলে কাগজে লেখা ফোটেনা। লেখা তো বন্ধ রাখা চলবেনা। কারণ, নিয়েছি, সচিত্র সন্ধানীর কোন একটা সংখ্যাও কামাই দেব না। প্রতিসংখ্যাতেই রের দিনগুলি' অবশ্যই যাবে। কয়েকদিন নানারকম কসরত ক'রে ক'রে রপ্ত — কি ভাবে কবজি বেঁকিয়ে কলমটা বিশেষ এঙ্গেলে আঙুলে পেঁচিয়ে লিখলে র কালি নিম্ন-মুখী হয়ে থেকে কাগজে হরফ ফোটায়। এই সাফল্যে বেশ আত্মতৃপ্তি

পাওয়া গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ লেখা সম্ভব হয় না। খানিক লেখার পরেই কবজি ব্যথা হয়ে যায়।

আরো একটা সমস্যা । ন্যাশনাল আর্কাইভে গিয়ে একাত্তরের খবরের কাগজ দেখা সম্ভব হচ্ছে না। ঐ সব খবর-কাগজ লাইব্রেরীর বাইরে ইস্যু করে আনার নিয়ম নেই। ঐখানে বসেই পড়তে বা নোট করতে হবে। তাহলে কিভাবে আমি ওগুলো দেখব? সে সমস্যার সমাধান ক'রে দিল শাহ্‌দত। সে তার বিচিত্রা অফিসের বাঁধানো খবর-কাগজ নিজের দায়িত্বে বিচিত্রা লাইব্রেরী থেকে বের করে বাসায় এনে দিল। প্রতি তিনমাসের খবর কাগজ একত্রে বাঁধানো থাকে। সে এক পেল্লায় ব্যাপার। শুয়ে শুয়ে ওটা ওল্টাবার কারো সাধ্যি নেই। এপ্রিল-মে-জুন এই তিনমাসের বাঁধানো বিশালাকার দৈনিক বাংলা আমার বিছানার পাশের টেবিলে রাখা হল। কোমরের ব্যথায় শয্যাশায়ী হবার পর আমার বেড রুমের ফার্নিচারের এ্যারেঞ্জমেন্টে কিছু রদবদল করা হয়েছিল। বিছানার পাশে আনা হয়েছিল একটা লম্বা টেবিল। ওইটাতে আমার লেখার সরঞ্জাম, দরকারী বই, কাগজ পত্র রাখা হত। যাতে শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে সব ব্যবহার করতে পারি। লেখা এগোচ্ছে। ব্যথাও কমেছে দিন পনের পর। ডাক্তার এখন একটু আধটু উঠে হেঁটে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। ব্যথা কমার দরকার ছিল। জুন মাস প্রায় এসে যাচ্ছে। একাত্তরের জুন মাস থেকেই তো গেরিলা অ্যাকশনের শুরু হয়। অ্যাকশনের ঘটনাগুলি যাতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি, তার জন্য ঢাকায় যে সব মুক্তি যোদ্ধা এখনও জীবিত আছে, তাদেরকে একে একে ডেকে তাদের বক্তব্য ক্যাসেটে বানীবদ্ধ করার কাজ শুরু করতে হবে।

এই রকম যখন ভাবনাচিন্তা করছি, মুক্তিযোদ্ধা আলম, বাদল, শাহ্‌দত, ফতেহ, জিয়া, এদের অনেকের সঙ্গেই ফোনে কথা বলছি, বাড়িতে আসার দিনক্ষণ ঠিক করছি, ক্যাসেটে তাদের বক্তব্য বানীবদ্ধ করছি — এই রকম সময়ে একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার মুখের ভেতরে বাঁদিকের মাড়ির ঘা টা একটু খানি বেড়েছে।

॥১২॥

জুন থেকে জুলাই, জুলাই থেকে আগস্ট, আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর — লেখা এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে আমার মুখের ভেতরের ঘা। মাড়ি ছেড়ে ওটা এখন জিভের তলার দিকে পা বাড়িয়েছে। ডাঃ তালুকদার প্রতি সপ্তাহে ওষুধ দিচ্ছেন, আমি ওষুধ খাচ্ছি আর চোখ কান বুঁজে লিখে যাচ্ছি। এখন আমার গবেষণার কাজও বেড়ে গেছে। অনেক বেশি বেশি মানুষকে ইন্টারভিউ করে তাদের বক্তব্য ক্যাসেটবদ্ধ করতে হচ্ছে, অনেকের বাড়িতে যেতে হচ্ছে। ক্যাসেটগুলি থেকে পরে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতেও কম সময় যাচ্ছে না। এর মধ্যে মুখের ভেতরের ঘায়ের কথা ভাববার সময় কোথায়? ভাবনা যে আসে না, তা নয়। জোর করে সরিয়ে রাখি। কি করব? লেখা অসমাপ্ত রেখে মিশিগানে চলে যাব? সেটাও তো মরার বাড়া হবে। তাছাড়া আমার হেলথ ইনস্যুরেন্স নেই, এত খরচ জোগাড় করব কোথা থেকে? গাজী আর শাহ্‌দত ছাড়া আর কেউ জানে

না ব্যাপারটা। এমনকি বোনেদেরও বলিনি। শাহ্যদত মাঝে মাঝেই অস্থির হয়ে বলে ওঠে, 'আম্মা, আপনি কিন্তু ঠিক করছেন না। জামীকে সব জানান। আপনার এখন মিশিগান চলে যাওয়া উচিত।'

আমি গোঁয়ারের মতো বলি, 'না মিশিগান যাব না।'

'আপনি যদি না জানান, তাহ'লে আমি জামীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব।'

আমি কঠিনকণ্ঠে বলি, ' খবরদার শাহ্যদত, তাহলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।'

শাহ্যদত নিরুপায় মুখ ক'রে চুপ হয়ে যায়।

ঘা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এখন থুতনির কাছে জিভের তলায় নেমে এসেছে। খুব ধীরে ধীরে গর্ত হয়ে যাচ্ছে। এই রেটে ঘা গভীর হ'তে থাকলে কয়েকমাস পরে থুতনির নিচ দিয়ে গলার ওপরে ফুটে বেরোবে।

এখন মাঝে মাঝে ভয় ধ'রে যায়। তালুকদারকে জিজ্ঞেস করি, 'ডাক্তার আরো যে গর্ত হ'য়ে যাচ্ছে।' ডাক্তার আশ্বাস দেন, 'আল্লাভরসা। ওষুধ তো দিচ্ছি।' গাজীও আশ্বাস দেয়, 'অত চিন্তা করবেন না। ভালো হ'য়ে যাবেন।'

ডিসেম্বরে সচিত্র সন্ধানীতে একাত্তরের দিনগুলি শেষ হ'য়ে গেল। গাজী এটা বই আকারে বের করবে বলেছে। এই বইমেলাতেই বের করবে। আমি এখন প্রেস কপি তৈরী করাতে ব্যস্ত। জানুয়ারী মাসের মধ্যেই কম্পোজ শেষ হওয়া উচিত। তারপর পেস্টিং আছে। বিশ-বাইশ ফর্মার বই হবে। পেস্টিংয়ের সময় নিজেকে অবশ্যই থাকতে হবে। নইলে কত যে ভুল চলে যাবে, তার ইয়ত্তা নেই। আমি চাই এই বইতে যেন একটাও ভুল না থাকে। অবশ্য একটাও ভুল থাকবে না, এমনটা হতেই পারে না, ভুল দু একটা থাকবেই, তবে মারাত্মক কোন ভুল যাতে না থাকে, সেদিকে অবশ্যই আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ডিসেম্বরের ২০ তারিখে ছোট ভাই পাশা এল ঢাকা বেড়াতে। তাকেও কিছু জানালাম না। তাকে বলা মানেই জামীর কানে যাওয়া। সে আর জামী প্রায়ই ফোনে কথা বলে থাকে।

পাশা আসার পর শাহ্যদত আরেকবার ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। 'আম্মা, আপনি আপনার অসুখটাকে বড্ড বেশি অবহেলা করছেন। এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমি কিন্তু পাশা মামাকে বলে দেব।' আমি ততোধিক ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, 'খবরদার। পাশাকে বললে জন্মে তোর মুখ আর দেখব না।'

'কিন্তু করছেন টা কি? অসুখের চিকিৎসা হবে না?'

আমি গোঁয়ারের মতো মুখ করে বললাম, ' ঘা টা বাড়তে বাড়তে যখন থুতনির নিচে ফুটো ক'রে বেরোবে, তখন আমি একগাদা ঘুমের বড়ি খেয়ে মরে থাকব।'

আজ অতীতের দিকে ফিরে ভাবতে যতোই হাসি পাক, সেই সময়ে আমি কিন্তু মনে মনে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম।। কোনদিকে না তাকিয়ে বইটার প্রুফ সংশোধন ও পেস্টিং শেষ কররে। ডাঃ তালুকদারের ওষুধও খেয়ে যাবো। তারপর যেদিন থুতনির নিচ দিয়ে ক্যান্সারের ঘা টা ফুটে বেরোবে, সেদিন আমি একগাদা ঘুমের বড়ি খাবো। সেই সময়ে এই

সিদ্ধান্তটাই আমার মনকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সেইজন্যই বোধহয় মাথা ঠাণ্ডা রেখে, একাগ্র চিত্তে একাত্তরের দিনগুলির প্রুফ সংশোধন ও পেস্টিং করে যেতে পেরেছিলাম।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটা খুব হৈ-হুল্লোড়ে কাটল। পাপা এসেছে ২০ তারিখে লণ্ডন থেকে। মধু মীনা ও বাচ্চারা এসেছে ২৪ তারিখে টরোন্টো থেকে। শামু এসেছে মিশিগান থেকে একই দিনে। অবশ্য অন্য প্লেনে অন্য সময়ে। পাপা আছে ছোট বোন ধলুর বাসায়। মধু বউ বাচ্চা নিয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে, শামু বরাবরকার মতো হোটেল সোনারগাঁওয়ে।

সন্ধানী প্রেসে আমার বইয়ের প্রুফ দেখছি বেশিটা সময়, ফাঁকে ফাঁকে তিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, খাওয়া-দাওয়া।

শামু এসেই জিজ্ঞেস করেছে, মুখের ভেতরের অবস্থা কিরকম। রেখে-ঢেকে বলেছি, 'একটু ঘায়ের মতো হয়েছিল। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছি, ভালো হ'য়ে যাবে।'

শামু নিজে এলোপ্যাথিক ডাক্তার। আমেরিকার এম,ডি ডিগ্রধারী এলোপ্যাথিক ডাক্তাররা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভয়ানক রকম বিরুদ্ধে। শামুও তার ব্যতিক্রম নয়। সে বলল, বুবু, বুঝেসুঝে কাজ করবেন। হোমিওপ্যাথিতে কখনই ক্যান্সার ভাল হয় না।

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললাম, কি যে বল। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা ক'রেই তো এর আগে আমার ক্রনিক মাথা ধরা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস সব সেরে গেছে।

শামু একটু হেসে বলল, 'বুবু ভুলে যাবেন না মানুষের দেহের ভেতরেই রোগ প্রতিষেধক এবং রোগ নিরাময়ের প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে। তাতেই বেশির ভাগ ছোটখাটো অসুখ সেরে যায়। বড়ো অসুখ, টাইফয়েড, ক্যান্সার এ সবের জন্য লাইফ-সেভিং ড্রাগ প্রয়োজন হয়। পেনিসিলিন অ্যান্টিবায়োটিক এসব আবিষ্কারের মূলে রয়েছে এই প্রয়োজনের প্রেরণা।'

হিউম্যান বডির ট্রিমেণ্ডাস হিলিং পাওয়ারের কথা ভাবতে ভাবতে আমি সন্ধানী প্রেসের দিকে রওনা দিলাম। আমার কি আত্মবিশ্বাসে একটুখানি চিড় ধরল? নাকি ভাল হব, এই আত্মবিশ্বাস ছিলই না? না হ'লে, ক্যান্সারের বীভৎস শেষ পর্যায়ে আত্মহত্যা করার কথা কেন ভেবে রেখেছি? কেউ কি সজ্ঞানে প্ল্যান করে আত্মহত্যা করতে পারে? শুনেছি এবং পড়েছি, যারা আত্মহত্যা করে, মুহূর্তের তীব্র উন্মাদনায় আত্মহত্যা করে বসে। তাহলে আমি এতদিন ধরে কেন মৃত্যু-চিন্তা করছি? আমার অবচেতন মনে কি কোন পাপবোধ কাজ করছে?

এলোমেলো চিন্তাধারা, ভাইদের সঙ্গে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, প্রেসে গিয়ে প্রুফ দেখা এসবের মধ্যে দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে ঘূর্ণির বেগে। প্রতিবছর ৩১ শে ডিসেম্বর রাতে শাহাদতের বাড়িতে নিউইয়ার্স ইভ পার্টি হয় খুব জাঁকজমক ক'রে। ঢাকা শহরের পুরো এলিট সমাজ নিমন্ত্রিত হন এই পার্টিতে। এর আয়োজন উদ্যোগ শুরু হয় দুইমাস আগে থেকে। এবছর শাহাদতের বউ সেলিনা বলল, 'খালা আমরা মেয়েরা এবার সবাই কালো শাড়ি পরব ঠিক করেছি। আপনাকেও পরতে হবে।'

'দুর। আমাকে আবার ওর মধ্যে টানাটানি কেন?' আমি প্রতিবছরই শাহাদতের পার্টিতে যাই এবং শেষ অবধি থাকি, আপত্তি সেটার জন্য নয় - - - এই অল্পবয়সী

পুত্রবধূদের সঙ্গে কালো শাড়ি পরতেই আমার আপত্তি। কিন্তু ওরা আমার কথা শুনলই না। শামীম আজাদ নানারকম যুক্তির বিন্যাস দেখিয়ে আমাকে ঠিকই পটিয়ে ফেলল। আমিও শেষমেষ উৎসাহিত হয়ে ভাবলাম, হোয়াই নট? কেন নয়? এইটাই যখন হবে আমার জীবনের শেষ নিউইয়ার্স ইভ তাহলে হোক তা অন্য সবার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাঁকজমকপূর্ণ।

কালো শাড়ি আর খুঁজে পাইনা। ছিল একটা চুমকি বসানো কালো শাড়ি, সে তো কবেই পুত্রবধূ ফ্রিডাকে দিয়েছি। শামীম, সেলিনা, কবিতা, অনু - - - ওরা সবাই নতুন কালো শাড়ি কিনেছে। আমি কিনতে রাজি হলাম না। তখন আমার এক নাতনী বাবু (ভালনাম গাজী শরমিন) তার কালো কাতান শাড়িটা আমাকে পরবার জন্য ধার দিল।

সেই রাতে শাহাদতের বাড়িতে নিউইয়ার্স ইভ পার্টিতে আনন্দ করতে করতে আমার মনে পড়ল মেরী কুরীর কথা। অনেকদিন আগে মেরী কুরীর জীবনী পড়েছিলাম। রেডিয়ামের আবিষ্কারক মেরী ও পিয়ের কুরী দম্পতি সারাজীবন দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে কঠোর গবেষণার সাধনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের আগে তরুণী মেরী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন, তখন একবার বন্ধু বান্ধবের উপরোধে পড়ে এক বল-নাচের আসরে যান। জীবনে ঐ একবারই। সে সময়ও তাঁর নাচের জুতো কেনবার মতো যথেষ্ট পয়সা ছিল না। সস্তার একরকম নাচের জুতো পাওয়া যেত, যা শুধু একরাতের নাচের জন্যই টিকত। মেরী সেই রাসেট-লেদারের সস্তা একজোড়া নাচের জুতো কিনে বল-নাচের পার্টিতে সারারাত নেচে ছিলেন। ভোরের দিকে সেই জুতো ছিঁড়ে ফাতরা ফাতরা হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা উল্লেখ ক'রে জীবনীকার বইতে মন্তব্য করেছিলেন, মেরী সারা জীবন দুঃখ দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কিন্তু একবারের জন্য হলেও সারারাত বল নাচের পার্টিতে কাটাবার মতো একটি মনোরম রাত তাঁর জীবনে এসেছিল। মেরীর জীবন কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবন কাহিনীর কোন মিল নেই। মেরীর মতো বড়ো কোন কাজও জীবনে করিনি, হেলাফেলায় জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, তবুও ১৯৮৫ সালের এই ৩১ ডিসেম্বরের শেষ রাতে (নাকি ৮৬ সালের ১ জানুয়ারীর প্রথম প্রহরে?) সবার সাথে আনন্দ করতে করতে আমার মেরী কুরীর কথাই মনে পড়ল।

॥১৩॥

আমার দিন ও রাত কাজে-কোলাহলে একেবারে ঠাসা। ফ্রিডা এসেছে ১৩ জানুয়ারী। গতবার সে ছুটি পায়নি, জামী একা এসেছিল। এবার ফ্রিডা ছুটি পেয়ে একা এসেছে, ২৬ দিন থাকবে আমার সঙ্গে। প্রুফ দেখার সাথে সাথে ফ্রিডাকে নিয়ে বেড়ানো, খোশ গল্প সবই চলছে। আমার জিভের তলার গর্তও ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছে। তখন খাবার জিনিস গর্তে পড়ে গেলে কুল্লি করে বের করতে বেশ সময় লাগে, কষ্টও হয়।

কিন্তু ফ্রিডা যাতে কিছু বুঝতে না পারে, সে জন্য খুব সাবধানে থাকি। ফ্রিডা আসার পর শাহাদত আবার বলা শুরু করেছিল, সে ফ্রিডাকে সব বলে দেবে। আমি ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখেছি । ডাঃ তালুকদারের কাছে গিয়ে বলি, 'ডাক্তার, ঘা যে বেড়েই চলেছে।কি হবে?'

ডাক্তার মাথা চুলকে ভরসা দেন, 'আল্লা ভরসা। ওষুধ তো খুব চিন্তা করে, মাথা খাটিয়ে দিচ্ছি।' গাজীও খুব ভরসা দেয়, 'আরে অত ভাবছেন কেন? সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

বলছে তো সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কি ভাবে হবে? একেক সময় হঠাৎ ভয়ের ঝাপটা এসে লাগে বুকের ভেতর, মনে হয় পায়ের নিচের মাটি হঠাৎ ধ্বসে গেছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার প্রুফ দেখা, ফ্রিডার জন্য প্ল্যান প্রোগ্রাম করা নিয়ে মেতে উঠি।

বাংলাদেশে প্রুফ দেখাটা যে কি খতরনাক্ কাজ, তা যে না দেখেছে, সে বুঝতে পারবে না। আমি তো দেখি ফাইনাল প্রুফ, তাতেই এত ভুল থাকে যে মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। শুধু যদি বানান ভুল হ'ত, তাহলেও না হয় কথা ছিল। আমার অনেক-মাথাখাটিয়ে-লেখা পুরো বাক্যের গঠনই ভেঙেচুরে অন্যরকম হয়ে যায়। চারটে, পাঁচটা প্রুফ দেখেও অনেকসময় শুদ্ধ হয়না। প্রেস যেহেতু গাজীর নিজের এবং আমি যেহেতু পণ করেছি ভুল সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রুফ তুলতেই হবে; তার জন্য সময় বেশি লাগছে, খাটনি বেশি হ'য়ে যাচ্ছে। এর জন্য পেন্টিং শুরু করতেও দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ফ্রিডা চলে গেল ৬ ফেব্রুয়ারী। পেন্টিং তিনদিন আগেই শুরু হয়েছে, ফ্রিডা থাকার জন্য বেশি সময় দিতে পারিনি । ৭ তারিখ থেকে প্রায় সারাদিন সন্ধানী প্রেসে। সকাল ১০টার মধ্যে গোসল ক'রে জাউভাত খেয়ে প্রেসে যাই। আর্টিস্ট সালাউদ্দিনের সঙ্গে পেন্টিং টেবিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেন্টিং করি। কতো যে ভুল এখনো রয়ে গেছে। সালাউদ্দিন ছেলেটা খুব ভাল। প্রতিটি ভুল বের ক'রে তাকে দিয়ে বারবার মেরামত করাই, সে একটুও আপত্তি করে না। ফাইনাল প্রুফ ও,কে, ক'রে দিয়েছি, তারপরও সেলোফেন আসার পর আঁতকে উঠেছি। পুরো বাক্যের মধ্যেই এত ভুল। আবার সেই অংশটুকু নতুন ক'রে কম্পোজ করিয়ে প্রুফ সংশোধন করে সেলোফেন তুলিয়েছি। কম্পোজিটাররাও খুব সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখাচ্ছে। 'খালাম্মা' তাদের এত খাটাচ্ছে। কিন্তু কিছু মনে করে না, হাসিমুখে খেটে দেয়। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 'খালাম্মা' মাঝে মাঝে তাদের সন্দেশ কিনে খাওয়ায়। জিভের তলার গর্তটা এত গভীর হচ্ছে যে সেখানে খাবার প'ড়ে গেলে পরিষ্কার করতে বড্ড কষ্ট হয়। তাই মাছ, শব্জি, চাল সব একত্রে সেদ্ধ ক'রে জাউভাত বানিয়ে গিলে গিলে খাই। সন্দেশ খেলেও গিলেই খাই। দাঁতে চিবিয়ে কিছু খেতে গেলেই গর্তে প'ড়ে যায় কিছুটা।

সন্ধানী অফিস ও প্রেস গাজীর বসত বাড়িতেই - - - একতলায়। দোতলা তিনতলায় ওরা নিজেরা থাকে। গাজীর বউ বীথি, মেয়ে বাবু, বাবুর নানী এবং চাচীরা সবাই আমাকে ভালবাসে। ওদের বাড়িতেও সর্বদাই যাতায়াত। সকাল ১০টা এগারোটায় খেয়ে বাসা থেকে আসি, পেন্টিংয়ের জন্য থাকি সন্ধ্যে ৬টা - ৭টা কোনদিন রাত ৮টা পর্যন্ত। এতটা সময়

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করা আমার স্বাস্থ্যে কুলোয় না। গাজীর পেন্টিং টেবিল আবার দাঁড়িয়ে কাজ করার মতো উঁচু, চেয়ারে বসে কাজ করা যায় না। তাই দুপুরে তিনতলায় উঠে যাই আরেকবার খাওয়া এবং দুপুরের বিশ্রামের জন্য। বীবি আমার নির্দেশ মতো সুপ কিংবা জাউভাত বা ঐ জাতীয় কিছু একটা তৈরী ক'রে রাখে।

এগারোদিন পর পেন্টিং শেষ হ'ল। ১৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭ টায় শেষ পাতার পেন্টিং করে বাড়ি এলাম। ইতিমধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী প্রচ্ছদ এঁকে ফেলেছেন। প্রচ্ছদ দেখে সবার মন উৎফুল্ল। এত চমৎকার প্রচ্ছদ হয়েছে। খুব দরদ দিয়ে এঁকেছেন।

১৪ তারিখ সারাদিন শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিলাম। আর দুদিন পর বই বেরোবে। আমার কাজ শেষ।

তখন হঠাৎ নতুন ভাবনা চমকে দিল মনের ভেতরটা। মরার কথা আর খেয়ালে নেই। এখন বাঁচার জন্য আকুতি। মিশিগান যদি না-ও যাই, কলকাতাতেও চিকিৎসা হতে পারে। গাজীর কাছে শুনেছি কবি সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ্‌র কানের পেছনে প্যারোটিড গ্লাণ্ডে টিউমার হয়েছিল, সেইটে তিনি কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্সার ওয়ার্ড থেকে অপারেশান করিয়েছেন। অপারেশানের পর রেডিয়েশানও দেওয়া হয়েছে। এখন বেশ ভাল আছেন। গাজীকে বললাম, আতিকুল্লাহ্‌ ভাইকে বাসায় নিয়ে এসো। তাঁর মুখ থেকে সব শুনি।

আতিকুল্লাহ্‌ ভাইয়ের মুখে সব শুনে বেশ ভরসা পেলাম। কলকাতা বাড়ির কাছেই, ওখানে খরচও অনেক কম হবে, আমার সাধ্যের মধ্যেই থাকবে।

এইসব চিন্তাভাবনা করতে আরো দুটো দিন গেল। ১৬ ফেব্রুয়ারী একাত্তরের দিনগুলির বাঁধাই কপি গেল বইমেলায়। আমি রোজ খানিকটা করে সময় 'সচিত্র সন্ধানীর' স্টলে বসি। দুচারটে দোকানের পরেই ডানা প্রকাশনীর স্টল। সেখানে শাহরিয়ার কবির তার বউ ডানা, মুনতাসীর মামুন, কাজীমুকুল, মুকুলের বউ বেবী এবং আরো অনেকে থাকে। দুই স্টল ঘুরে বেশ আড্ডা দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে লেখক সমরেশ মজুমদার। তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। গাজীর মুখে শুনে সেও আমাকে 'খালাম্মা' বলে সম্বোধন করল। আরো একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল কামাল ওয়াহেদ। ঢাকার ছেলে, তবে বিদেশেই থাকে বেশি। সে সমরেশ মজুমদার ও নবনীতা দেবসেনকে ঢাকায় নিয়ে এসেছে।

আমি কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যেতে চাই শুনে সমরেশ এবং কামাল কলকাতায় সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিল। আমার যাওয়ার তারিখ ঠিক হ'ল ২৪ ফেব্রুয়ারী। কামাল এবং সমরেশ আগামীকাল ২২ তারিখে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে। আমি কামালের হাতে আমার ৮২ সালের অপারেশানের সব কাগজপত্র ও এক্স্‌রে-প্লেট দিয়ে দিলাম। সে আগেই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে দেখা করে তাঁকে সব বলে রাখবে।

আমি রাত্রিবেলা জামীকে ফোন করে জানালাম যে আমার মুখের ভেতরে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং চিকিৎসার জন্য আমি ২৪ তারিখে কলকাতা যাচ্ছি। জামী শুনে প্রবলভাবে আপত্তি করে বলল, 'কেন, কলকাতা কেন? তোমার এখানে চলে আসা উচিত।' আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম যে, কলকাতাতেও ভালো চিকিৎসা হয়। তার

চিন্তার কোন কারণ নেই। তবু সে আপত্তি জানাতে লাগল। সময় পার হয়ে যাওয়াতে আর বেশি কথা বলা সম্ভব হ'ল না।

আমি ২২ তারিখে সকালে কলকাতার টিকেট কাটলাম, ব্যাংকে গিয়ে ডলার কিনলাম। আগামী কাল সকাল নটায় ভিসা অফিসে যাব ইণ্ডিয়ার ভিসা নিতে। গাজী নিয়ে যাবে।

২২ তারিখ বিকেলে এবং রাত্রে অনেকগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটল।

কলকাতা পৌঁছেই সমরেশ গাজীকে ফোন করে জানাল যে একটি পরিবারে আমার থাকার বন্দোবস্ত তারা করে ফেলেছে। ২৪ তারিখ দুপুরে সে আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দমদম এয়ারপোর্টে আসবে আমাকে রিসিভ করতে। কামাল আজ রাতেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আমার কেস হিস্ট্রি জানাবে।

বিকেলে গাজীকে বললাম, 'আতিকুল্লাহ ভাইকে আরেকবার আমার বাসায় নিয়ে এসো। এখন তো যাওয়া একেবারে স্থির হয়ে গেছে, তাঁর কাছ থেকে সব কথা ভালো করে জেনে নিই।'

গাজী সন্ধ্যাবেলা আতিক ভাইকে আমার বাসায় নিয়ে এল। আতিক ভাই খুবই স্বাভাবিক গলায় তাঁর টিউমার অপারেশন ও তৎপরবর্তী রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টের কথা বলে গেলেন। তিনিও কলকাতায় এক বন্ধুর বাসায় ছিলেন। নিজেই চলে যেতেন মেডিক্যাল কলেজে। রেডিয়েশন দেবার পর স্বভাবতঃই একটু দুর্বল লাগত। তাই বেশির ভাগ সময় ট্যাকসিতে যাতায়াত করতেন। বললেন, 'আপনার জন্য সেইটেই সুবিধে হবে। ট্যাকসি করে সোজা চলে যাবেন মেডিক্যাল কলেজের সেকেণ্ড গেটে। ক্যান্সার- ওয়ার্ডটা ওইদিকেই। ফার্স্ট গেটে নামবেন না কিন্তু। ওখানে নামলে অনেকটা হাঁটতে হবে আপনাকে।' রেডিয়েশন দেবার পর কি রকম লাগে, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কিছু হয় কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ' নাঃ, তেমন কিছু নয়। একটু দুর্বলতা - - - তা ওতো সব অসুখেই লাগে। শুধু একটু খানি খাওয়ার অসুবিধে হয় কয়েকটা দিন। রেডিয়েশন দেবার পর জিভে-গলায় ঘা উঠে যায় কিনা, পানি পর্যন্ত গেলা যায় না।'

বলে কি! শুনে আমার চোখ ছানাবড়া। পানি পর্যন্ত গেলা যায় না? এই বার আমি নার্ভাস হয়ে গেলাম। কলকাতায় অপরিচিত পরিবারে থাকব, একা একা ট্যাকসি ক'রে যাওয়া আসা করতে হবে, বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে যাঁদের বাসায় থাকব তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হবে।

একটু পরে আতিক ভাইকে নিয়ে গাজী চলে গেল। আমি বসে বসে আকাশ- পাতাল ভাবতে থাকলাম, কি করব বুঝে উঠতে পারছি না।

রাত দশটার দিকে জামীর ফোন এল। জামী খুব দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'মা, আমি গত কাল থেকে এই পর্যন্ত খুব ভাবনাচিন্তা করলাম। মামু মামার সঙ্গেও কথা বললাম। তোমার কিছুতেই কলকাতা যাওয়া হবে না। তুমি আজই টিকেট বদলে আমেরিকার টিকেট কেনো। এখানে চলে এসো।'

স্বস্তিতে আমার চোখে পানি এসে গেল। বললাম, ' আমিও এরই মধ্যে মত বদলেছি। আমেরিকাতেই যাব। আমিও ফোন বুক করতে যাচ্ছিলাম।'

জামী জিজ্ঞেস করল, কবে রওনা দিতে চাও? আমি বললাম 'আমেরিকান ভিসা পেতে দুতিনদিন দেরি হতে পারে। ২৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট আছে। ঐ দিনের টিকেট কাটব। ডেট্রয়েট পৌছব ১ মার্চ। তুমি ৩ তারিখ সোমবারেই ডাঃ ম্যাকিন্টশের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবে।'

গান্ধীকে রাত্রে ফোন করে জানালাম আমার মত পরিবর্তন ও জামীর ফোনের কথা। তবে আগামী কাল সকাল ৯ টায় গান্ধীর সঙ্গে বেরোব ঠিকই। ভারতীয় ভিসা অফিসে যাওয়ার পরিবর্তে প্রথমে যাব ট্রাভেল এজেন্সিতে কলকাতার টিকেট বদলে আমেরিকার টিকেট কিনতে। ব্যাংকে গিয়ে বাকি ডলার কিনব। কলকাতা গেলে দুশো ডলার দেয়। আমেরিকা গেলে ছশো। তারপরে যাব আমেরিকান ভিসা অফিসে।

২৩ তারিখ সকালে যখন গান্ধীর বাড়িতে পৌছলাম, তখনই তার ফোনটা বেজে উঠল। কলকাতা থেকে ট্রাংকল এবং সেটা সমরেশ মজুমদারের। কাকতালীয় ভাবে আমি ও বাড়িতে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা এসেছে। কিছুটা নাটকীয়ও বলা যায়।

সমরেশ মজুমদার জানাল, কলকাতার ডাক্তার খালাম্মার অপারেশানের কাগজপত্র ও এক্স্‌রে রিপোর্ট দেখে বলেছেন, খালাম্মার যে ধরনের অপারেশান হয়েছে। তাতে কলকাতায় তাঁর চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। বম্বের টাটা ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে তাঁকে যেতে হবে।

গান্ধী তাকে জানাল যে খালাম্মাও মত পরিবর্তন ক'রে আমেরিকা যাচ্ছেন ছেলের কাছে। সেখানে তাঁর পুরনো ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসা করাবেন।

পরের কয়েকটা দিন ভয়ানক ব্যস্ততায় কাটল। ট্র্যাভেল এজেন্সি, ব্যাংকে, ভিসা অফিসে দৌড়াদৌড়ি ছাড়াও আত্মীয়-বন্ধু সবাইকে জনে জনে ফোন করে আমার প্ল্যান পরিবর্তনের কথা জানানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। যাচ্ছি শীতের মধ্যে, ওয়ার্ডরোব খুলে গরম কাপড় চোপড় বের করাও আরেক ঝামেলা। কোথায় কি রেখেছি, কোট পাইতো, টুপি পাইনা। মোজা পাইতো দস্তানা পাই না।

২৬ তারিখ রাত্রে আবার জামীর ফোন, 'টিকেট, ভিসা সব হয়েছে?'

'হয়েছে। ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কবে করেছ?'

১০ মার্চ

'ম –শ –ই মার্চ। কেন, এত দেরিতে কেন?'

'এর আগে আর ডাক্তারের সময় খালি নেই।'

আমি ফোনের মধ্যেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সময় নেই মানে? এমার্জেন্সি বলে একটা কথা আছেন না? আমার জিভের তলায় দেড় ইঞ্চি গর্ত হয়ে গেছে, আমি বিশহাজার মাইল দূর থেকে তার কাছে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছি, আর ডাক্তার আমাকে দশদিন পরে ডেট দেবে? তা হয় না। তুমি আজই ডাক্তারকে ফোন করে বোঝাবে দিস ইজ অ্যান এমার্জেন্সি। তাকে তিনতারিখেই ডেট দিতে হবে। তাকে বলে দেবে ডেট দিক চাই না দিক, আমি তিন তারিখেই সকালে সোজা তার চেম্বারে ঢুকে যাব।'

ঢাকা থেকে ডেট্রয়েটের জার্নি হীথরো বিমানবন্দরের চারঘন্টা ওয়েটিং ধরে টানা ৩৬ ঘন্টা। কথা ছিল পাপা লিপা ওরা এয়ারপোর্টে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওদের জন্য আমার সদ্য প্রকাশিত একাত্তরের দিনগুলি কয়েকখণ্ড সঙ্গে এয়ারব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছি। কিন্তু দেখা হল না ওদের সঙ্গে। ঢাকা থেকে ঠিক সময়ে ছেড়েও বোম্বেতে কি অজানা কারনে লেট হয়ে প্লেন যখন হীথরো বিমানবন্দরে পৌছোল, তখন কোন মতে এই প্লেন থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে ডেট্রয়েটের কানেকটিং ফ্লাইট ধরতে পারলাম।

আমেরিকান স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় ডেট্রয়েট বিমানবন্দরে পৌছলাম। শীতকাল, বিকেল না বলে সন্ধ্যা বলাই উচিত। কারণ সন্ধ্যার আবছা আঁধার এর মধ্যেই চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে। চেকিং সেরে বাইরে এসে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হ'লাম জামী ও ফ্রিডার। ওরা হাসিমুখে আমাকে জড়িয়ে ধরল বটে, কিন্তু ওদের চোখে দেখলাম অভিমানের ছায়া। কেন আমি ওদের কাছ থেকে এতদিন এতসব কথা লুকিয়ে রেখেছি? কিন্তু মুখে কারো কোন অভিযোগ নেই। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আমার মনের মধ্যেও কম ঝড় বইছেনা। এখন মৌখিক ভাবে এসবের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। ওদের চেষ্টা দেখলাম, আমি যাতে স্বস্তিতে থাকি, সেই দিকে।

ডঃ ম্যাকিন্টশ ৩ তারিখেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন — সকাল সাড়ে ৯ টায়। গেলাম জামীর সঙ্গে। পথে ভাবতে ভাবতে গেলাম, ম্যাকিন্টশের কথাই ফলল। তিনি ৮২ সালে বলেছিলেন, 'ক্যান্সার সেল আর নেই। আপনি সম্পূর্ন বিপদমুক্ত।' তারপর একটু হেসে যোগ করেছিলেন, 'অবশ্য শরীরের অন্য জায়গায় হলে আমার দোষ নেই।'

তাই হয়েছে। শরীরের অন্য জায়গাতেই হয়েছে। চোয়ালের বাঁদিক তো ডানদিক থেকে অনেকটা দূর। সেটা শরীরের অন্য জায়গাই বটে।

ডাক্তার দেখে প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর দিলেন একচোট বকুনি: এত দেরি করে এসেছেন কেন?' আমিও বাসা থেকে জবাব শানিয়ে নিয়ে গেছিলাম, দুর্মুখ বলে দুর্নামও আছে আমার। বললাম 'কেন দেরি করে এসেছি বলব? আপনি তো জানেন আমার হেলথ ইনস্যুরেন্স নেই। এদেশে চিকিৎসার খরচ প্রচণ্ড। এখানে লোকে হেলথ ইনস্যুরেন্স করে, তাদের চিকিৎসার সব খরচ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী দেয়। অথচ ৮২ সালে আমার চিকিৎসার খরচ সবটাই আমাকে ঘর থেকে দিতে হয়েছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম কি কিছু কম নিতে, আপনারা এক পয়সাও কমান নি। আপনাদের এই ধনী দেশে আপনারা ডাক্তাররা সবচেয়ে ধনী, কিন্তু একটা মানুষের ইনস্যুরেন্স নেই জেনেও আপনারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননা। অথচ আমাদের গরীব দেশে বড়ো ডাক্তাররা অনেক অভাবী পেসেন্টের কাছ থেকে এক পয়সাও কি নেন না। এবারও আমার ইনস্যুরেন্স হয় নি, তাই আসব কি আসব না করতে করতে এত দেরি হয়ে গেছে।'

যেন ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনছেন, এমনি গভীর মনোযোগী মুখ করে ডঃ ম্যাকিন্টশ আমার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনলেন। তারপর কোন জবাব না দিয়ে ব্যস্তভাবে পাশের টেবিল থেকে একটা যন্ত্র হাতে তুলে মুখের ভেতরটা পরীক্ষা করতে করতে বললেন,

'ক্যান্সার সেল জিভের তলা দিয়ে একটু বেশীই ছড়িয়ে গেছে। এতটা জায়গা অপারেশান করে বাদ দেওয়া যাবে না। তাতে আপনার কথা বলার ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে যাবে। আগে কিমোথেরাপী দিয়ে জায়গাটা কমিয়ে নিতে হবে। তারপর অপারেশান।'

কি-মো-থেরাপী। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রবন্ধ প'ড়েছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এর যা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, তাতে ডাক্তাররাই ভয় পায় একে। ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সবচেয়ে নিশ্চিত নিরাময় হ'ল অপারেশান। কিন্তু বেশি জায়গা নিয়ে সেল ছড়ালে প্রথমে কিমোথেরাপী দিয়ে আক্রান্ত জায়গাটা কমিয়ে নিয়ে তারপর অপারেশান করাই হচ্ছে নিয়ম।

কিমোথেরাপী যিনি দেবেন সেই অংকোলোজিস্টয়ের নাম ডাঃ আহমেদ সামুরী। লেবাননের ছেলে, ইরাকে ডাক্তারী প'ড়েছেন। গত ষোলবছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করছেন। বউ ফিলিপাইনের মেয়ে, নার্স—এখন দুজনেই আমেরিকান নাগরিক। একটি মেয়ে, নাম নাদিয়া, বয়স আট।

না, এতসব কুষ্ঠি-ঠিকুজি প্রথম দিনেই যোগাড় হয়নি। ডাক্তারটি অন্য আমেরিকানদের মতো যান্ত্রিক নন, বোধহয় উপদ্রুত মধ্যপ্রাচ্যের উন্মূলিত মানুষ বলেই। চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে আমার কথা, আমার দেশের কথা জানতে চেয়েছেন, নিজের কথা, নিজের দেশের কথা বলেছেন। নার্স বউ মাঝে মাঝে চেম্বারে এসে তাঁকে সাহায্য করেন, তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের স্কুল বন্ধ থাকলে মা মাঝে মাঝে মেয়েকে চেম্বারে নিয়ে আসেন। সেই ফুট ফুটে হাসিখুসী মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব গড়ে উঠেছে।

ডাক্তার সামুরী প্রথম কয়েকদিন ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদির বিভিন্ন রকম বিস্তারিত টেষ্ট করার ব্যবস্থাপত্র দিলেন। চেষ্ট এক্সরেও করানো হল।

প্রত্যেক ডাক্তারের চেম্বারে গেলে নার্স যে প্রশ্নটা অবশ্যই করবে, তা হল 'তোমার ইনস্যুরেন্স আছে? হাসপাতালে ভর্তি হবার সময়ও অবধারিত প্রশ্ন এটা। উত্তর সবজায়গাতেই একই, না, নেই। এটা শোনার পরও সবখান থেকে সমান বিল আসে। কেউ একপয়সা ছাড়ে না। কেবল ব্যতিক্রম দেখলাম ডাঃ সামুরীর বেলায়। তিনি ব্লাড টেষ্ট তাঁর চেম্বারেই করে থাকেন। কিমো পেশেন্টদের ঘনঘন রক্তপরীক্ষা করে দেখতে হয়। সামুরী যতবার রক্ত পরীক্ষা করলেন, একবারও ফি নিলেন না। এমন কি চেষ্ট এক্সরে-র ক্লিনিকেও অনুরোধ করে পাঠালেন,- আমার হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স নেই তারা যেন এক্সরে র ফি-র ব্যাপারে একটু বিবেচনা করে।

আমাকে কিমোথেরাপী কি ভাবে দেওয়া হবে, সে প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাঃ সামুরী বললেন, 'আপনাকে যে ওষুধটা দেব, সেটা হল প্লাটিনাম। আর তার সাথে ফাইভ এফ ইউ বলে আরেকটা ওষুধ।'

প্লাটিনাম? তার মানে সোনার চেয়ে দামী যে ধাতু, সেইটে?

হ্যাঁ, সেই প্লাটিনাম ধাতুই। তবে ধাতব অবস্থায় নয়, তরলীকৃত অবস্থায় স্যালাইন গ্লুকোজের সঙ্গে মিশিয়ে শিরার ভেতর দিয়ে শরীরে ঢোকাতে হবে। তার জন্য হাসপাতালে থাকতে হবে সাতদিন। তিনমাসে তিন বার দিতে হবে, তিনমাসে তিন বার হাসপাতালে যেতে হবে, থাকতে হবে প্রতিবারে সাতদিন করে।

কিমোথেরাপীর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া?

ডাঃ সামুরী সে সম্বন্ধেও আমাকে সবিস্তারে জানালেনঃ প্রচণ্ড বমি হবে, জিভে-গলায় ঘা উঠে যাবে, রক্তের শ্বেত কণিকা বেশিরভাগ মরে যাবে, মাথার চুল সব পড়ে যাবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রায় লোপ পাবে।

বলে কি। এযে মরারও বাড়া হবে। আতিক ভাই শুধু জিভে-গলায় ঘায়ের কথা বলেছিলেন, অন্য কিছুর কথা তো বলেন নি। তবে তাঁরটা কিমোথেরাপী ছিল না। রেডিয়েশান থেরাপী ছিল, তাই বোধহয়। কি জানি। এখন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সামুরী আরো বললেন, 'এই সব শক্তিশালী কেমিক্যালস্ —যারা ক্যান্সার সেল ধ্বংশ করার ক্ষমতা রাখে, তারা শরীরে ঢুকলে ভালো সেলগুলো তো এমনিতেই মরে যাবে। এটুকু অসুবিধে সহ্য করতেই হবে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য।' তবে আশ্বাসও দিলেন, এগুলো সবই সাময়িক। দুএক সপ্তাহের মধ্যেই সব আস্তে আস্তে সেরে যাবে।

'মাথার চুল?'

'চুলও আবার নতুন করে গজাবে। তবে তিনমাস পরে। কিমোথেরাপী যখন একেবারে বন্ধ হবে, তার একমাস পর থেকে নতুন চুল গজাতে শুরু করবে।"

শুনে আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করি। সামুরী আরো আশার বাণী শোনালেন। কিমোথেরাপীর ওষুধ দিনে দিনে উন্নতমানের হচ্ছে। পাঁচবছর আগেও এত শক্তিশালী, এত অব্যর্থ ওষুধ ছিল না। যে উন্নত মানের ওষুধ তিনি আমাকে দেবেন, তাতে আমার ক্যান্সারসেল নিঃসন্দেহে ধ্বংশ হবে।

॥১৫॥

ডাক্তার যা যা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সবই একে একে ফলে গেল— বেশ বিশ্বস্ততার সাথেই। কোন হেরফের হ'ল না। জিভে গলায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ির মতো এমন ঘা উঠল যে পানিটুকু পর্যন্ত গিলতে পারিনা। রক্তের শ্বেত কণিকা এত কমে গেছে যে ডাক্তার সাবধান করে রেখেছেন— যদি জ্বর ওঠে তাহলেই সর্বনাশ। তাহ'লে যেন সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়। রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংশ মানে দেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাও ধ্বংশ।

এদেশে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ এবং যন্ত্রপাতি এত আছে যে ডাক্তারদের মহা-উৎসব। রোগীকে কচু-কাটা করে তারা আবার জোড়া লাগায়, কতো পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে সফল হয়। তাতে দুনিয়া জোড়া নাম হয় তাদের। কিন্তু রোগীর ওপর দিয়ে যে কি-ই কষ্ট যায়, তার খবর রোগী ছাড়া আর কে রাখে? কিমোথেরাপী তো অতি সামান্য ব্যাপার, ডাক্তারদের কাছে নস্যি। কিন্তু তারই ধাক্কায় এই বঙ্গদেশবাসী রোগীটির যে কি প্রাণান্ত অবস্থা তা ওদের বোধগম্য হয়না।

হাসপাতালে শিরা দিয়ে শরীরে স্যালাইন -গ্লুকোজ যায়, তাই বমির চোটে মুখ দিয়ে কিছু খেতে না পারলেও শরীর জলশূন্য হয় না। কিন্তু বাড়ি আসার পর শিরা-বাহী জল শরীরে যাওয়া বন্ধ, মুখ দিয়ে কিছুই খাওয়া যাচ্ছেনা। ক্ষুধা তৃষ্ণা সব লোপ পেয়েছে।

কিছুই গিলতে পারছি না, অথচ বমি বন্ধ হচ্ছে না। ফলে দুদিন পরে শরীরে ডি-হ্যাইড্রেসান হ'য়ে গেল। ডাক্তার বললেন, শীগগীর আমার চেম্বারে আসুন। আবার শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন-গ্লুকোজ দিতে হবে।

ডাক্তারের কাছে এই বিধান অতি সহজ। কিন্তু পরবর্তী চারদিন ধরে, প্রতিদিন চারঘন্টা করে আবার যে শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন দেওয়া হ'ল, তার যন্ত্রনা রোগীর ওপর দিয়ে কি যে গেল, সেটা ডাক্তারদের কাছে ধর্তব্যই নয়।

এত প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন রাত্রির ব্যবধান ঘুচে গেল, প্রতিটি মুহূর্ত যন্ত্রনায় বিদীর্ন। বিদেশী মেয়ে ফ্রিডা যে ভাবে আমার সেবাযত্ন করছে, মনে হ'ল আমি যেন ওর শ্বাশুড়ী নই। ওরই এক অত্যন্ত অসুস্থ শিশু সন্তান। ধ'রে ধ'রে বাথরুমে নিচ্ছে। কার্পেটে বমি করে ফেললে নিজেই তা পরিষ্কার করছে— এদেশে তো আর কাজের লোক নেই। বাথটাবে বসিয়ে নিজের হাতে গায়ে সাবান মাখিয়ে মগ দিয়ে মাথায় পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দিচ্ছে। গা-মাথা মুছিয়ে পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে—আমার তো দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। কিছুই গিলতে পারছিনা। অথচ হরেক রকম সুপ,জুস বানিয়ে আনছে —যদি কোনটায় একটুখানি রুচি হয়। কিন্তু যার ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইয়েরই বোধ লোপ পেয়েছে, তার রুচি আসবে কেথেকে?'

একেকবার ভাবি, জীবন কি অপার রহস্যময়। এইরকম কঠিন অসুখে না পড়লে তো এক বিদেশী মেয়ের এইরকম সেবাপরায়ণ চেহারা দেখতে পেতাম না। একদিকে অসাধারণ কিছু পেতে হ'লে কি অন্যদিকে তার জন্য বিশাল মূল্য দিতে হয়?

তার ওপর এত মানুষের ভালোবাসা। দেশ থেকে অনবরত চিঠি, টেলিগ্রাম, গেট-ওয়েল কার্ড আসছে - - - বোনদের, ভাইদের, ভাগনে-ভাগ্নেদের, বন্ধুদের, আমার ছেলে-মেয়েদের। ট্র্যাংকেলও পাচ্ছি ঘনিষ্ট দুতিনজনের কাছ থেকে। এবারে স্বতঃফূর্তভাবে টাকাও আসছে বাদলের কাছ থেকে, আলমের কাছ থেকে, পাশার কাছ থেকে, মঞ্জুরের কাছ থেকে। যে যতটা পারছে, সাধ্যমতো পাঠাচ্ছে।

সামুরীর চেম্বারে চারদিন আবার স্যালাইন -গ্লুকোজ 'খাওয়ার' পর অবস্থা একটু ভালো হ'ল। একটু একটু লিকুইড গিলতে পারছি। তাও এক অদ্ভুত কায়দায়। এদেশে একরকম অ্যানালজেসিক স্প্রে পাওয়া যায়। চেরি কিংবা স্ট্রবেরি ফলের আস্বাদ-যুক্ত। হাঁ করে এইটে মুখের ভেতরে স্প্রে করলে মিনিট খানেকের জন্য জিভ, গলা পুরো জায়গাটা অসাড় হয়ে যায়। তখন লিকুইড গিললে ফুস্কুরি ঘায়ের জন্য ব্যথা লাগে না। পেশেন্টকে আরাম দেবার জন্য কতোরকমের ব্যবস্থা যে আছে এদেশে, তার ইয়ত্তা নেই।

দশ বারোদিন পর থেকে ফুস্কুরিগুলো কমতে লাগল। কিমো আরম্ভ করার দুসপ্তাহ পরে যেদিন ডঃ সামুরীর অফিসে গেলাম, সেদিন তিনি মুখের ভেতরের অবস্থা দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিমোর জন্য যে ঘা উঠেছিল, সেগুলো মিলিয়ে গেছে। আর জিভের তলায় ক্যানসারের গর্তও অনেকটা বুজে এসেছে।

মহা খুশি হ'য়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু বিকেল হ'তে হ'তে দুই চোয়ালে একটু একটু ব্যথা করতে লাগল। পরদিন দুই ঠোঁট ফুলে গেল, কান পর্যন্ত ফোলা এবং প্রচন্ড ব্যথা, জিভে আবার নতুন করে ছোট ছোট ফুস্কুড়ির মতো ঘা উঠল।

প্রচন্ড ভয় পেয়ে আবার সামুরীর চেম্বারে গেলাম। তিনি ভালো ক'রে দেখে আশ্বাস দিলেন, ভয়ের কিছু নেই, কিমোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।একবার কমে আবার হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার আবার মনে পড়ল মায়ের কথা। অপারেশানের কয়েকদিন পর একটু ভালো হ'য়েই আবার রিলাপ্‌স করেছিল। আমার মনে হ'ল আমারো তাই হ'য়েছে। আমি আর বাঁচব না। এখন আর মনেও নেই যে, এই আমি ঢাকায় থাকাকালীন ৮৫ সালে ঘুমের বড়ি খেয়ে মরতে চেয়েছিলাম। এখন বাঁচার আকুতিতে মনে প্রচন্ড মৃত্যু ভয় ঢুকল।

দুদিনে অবস্থা আরো খারাপ হ'ল। অসহ্য ব্যথা, মুখ ফুলে ঢোল। ব্যথা কমানোর জন্য কোডিন-যুক্ত শক্তিশালী ওষুধ এসেছে। সামুরীও একটু উদ্বিগ্ন হয়েছেন মনে হ'ল। পরদিন নিজেই ফোন করে চেম্বারে যেতে বললেন। রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। শ্বেতকণিকা খুব বেশি কমে গেছে। চিন্তিত মুখে বললেন, জ্বর উঠলে আমাকে জানানোর দরকার নেই। সোজা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাবে।

কথা বলতে পারছিনা এমনই ফোলা আর ফুস্কুড়ি ঘায়ের জ্বালা। লিখে লিখে জামী, ফ্রিডার সঙ্গে সলোপ চালাচ্ছি। মনের জোর বজায় রাখার জন্য ঢাকার সবাইকে চিঠি লিখছি। অনেক চিঠি এসেছে, সে সবের জবাব।

সারারাত ঘুম আসেনা। দিনে তবু জামী ফ্রিডার সঙ্গে কথোপকথন, চিঠি লেখা ও পাওয়া, কাগজপড়া ইত্যাদি নানা ক্রিয়াকর্মে সময় কেটে যায়, রাত যেন আর কাটতে চায় না। চারদিক নিঝুম, সবাই ঘুমে, আমি তখন কষ্টের দমচাপা সময়ে খালীল জিবরানের কবিতা পড়ি। জিবরানের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৪ সালে। সে সময় প্রথম আসি যুক্তরাষ্ট্রে, এই মিশিগানেই আমার বান্ধবী বারবারা মার্কস আমাকে জিবরানের 'দ্য প্রফেট' বইটি উপহার দিয়েছিল। ছোট্ট সাইজের পকেট এডিশন। হাতব্যাগে ভরে রাখা যায়। সেই বই পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে আমার বড় ছেলে রুমী জিবরানের সমস্ত বই একে একে কিনে পড়ে। জিবরানের নিজের হাতে আঁকা ছবিসহ 'দ্য প্রফেট' এর শোভন সংস্করণ রুমীকে পরে উপহার দিয়েছিল শামু। কিন্তু বারবারার দেওয়া এই ছোট্ট পকেট সাইজ বইটি আমি এই এতবছর আমার হাত-ব্যাগে বহন করেছি। যখনই ইচ্ছে হয়েছে, বের করে পড়েছি। এখনও এই নির্ঘুম, নিঝুম রাতে জিবরান আমার সঙ্গী। তার পেইন নামের কবিতাটি আবার পড়ি :

" Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding"

'তোমার উপলব্ধিকে আবৃত করে রাখে যে শক্ত খোলস, বেদনাই তাকে বিদীর্ন করে।'

তাই যদি হয়, তাহলে সেই একাত্তর থেকে এত যে দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, যন্ত্রনা পেয়ে আসছি, তাতেও কি আমার উপলব্ধির, আমার চৈতন্যের আবরণ বিদীর্ন হয়নি?

জিবরানের পংক্তিগুলিতে সান্ত্বনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করি :

' সূর্যের আলোয় উদ্‌ভাসিত হবার জন্য ফলের বীজকে বিদীর্ন হতে হয়; বেদনা তোমার জন্য তাই।

জীবনের প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে যদি তোমার হৃদয়কে বিস্ময়াবিষ্ট রাখতে পার, তাহলে দেখবে বেদনাকেও তুমি আনন্দের চেয়ে কম বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে করবে না।

তোমার শস্য ক্ষেতের ওপর ব'য়ে যাওয়া ঋতুগুলিকে তুমি যেমন মেনে নিয়েছ, তোমার হৃদয়ে ব'য়ে যাওয়া ঋতুগুলিকেও তেমনি ভাবে মেনে নাও।

তোমার যত বেদনা, তার বেশির ভাগ তো তুমি নিজেই বেছে নিয়েছ। বেদনা হচ্ছে তোমার জীবনের তিক্ত ওষুধ। তোমার সত্তার ভেতর যে চিকিৎসকটি বসে আছে, সে বেদনাদ্বারা তোমার আত্মাকে নিরাময় করে।

সুতরাং বিশ্বাস রাখ তোমার চিকিৎসকের ওপর, তার দেওয়া ওষুধ নীরবে, প্রশান্তির সঙ্গে পান কর। কারণ যে কঠিন হাতে সে চিকিৎসার ব্যবস্থা দেয়, সেই হাতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন সেই অদৃশ্য মহাশক্তি। যে পাত্রে ভরে চিকিৎসক ওষুধ আনে, যে পাত্রে চুমুক দিতেই তোমার ঠোঁট পুড়ে যায়, জেনো, সে পাত্র তৈরী করেছেন সেই অদৃশ্য মহাশক্তি, তাঁর চোখের জলে সিক্ত কাদামাটি দিয়ে।'

সেই অদৃশ্য মহাশক্তি, সেই বিশ্বনিয়ন্তা যিনি একই সঙ্গে কঠিন এবং কোমল, রুদ্র এবং প্রেমময়, তাঁর প্রতি বারবার প্রণতি জানাই। আমার উদভ্রান্ত মনে শান্তির প্রলেপ পড়ে, অবশেষে ক্লান্ত চোখে তন্দ্রা নামে।

দুতিনদিন পর ফোলা আর ব্যথা কমল। এখন কথা বলতে পারছি। একটু একটু লিকুইডও গিলতে পারছি।

এরই মধ্যে মাথার চুল পড়া শুরু হয়েছে। আজানুলম্বিত কেশবতীর দেশের মেয়ের কাছে এ এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। প্রতিবার আঁচড়ানোর সঙ্গে চিরুনীতে গোছা গোছা চুল উঠে আসছে। বাগানে ঘাস ওপড়ালেও তো একটানে এত ঘাস উঠে আসে না। লম্বা চুলে নিজ হাতে চিরুনী চালাতে পারি না। ফ্রিডা আঁচড়ায়, জামী চেয়ে চেয়ে দেখে। আমার চেয়ে জামীরই যেন কষ্ট বেশি। ডাক্তার তো আগেই বলেছে, সব কিমো পেশেন্টেরই চুল প'ড়ে যায়, তারা তখন পরচুলো পরে। কিমো বন্ধ করার একমাস পর থেকে আবার চুল গজাতে শুরু করবে। কিমো-পেশেন্টদের পরবার জন্য সস্তার উইগ্ বিক্রির বিশেষ বিশেষ দোকান আছে। কেন এই বিশেষ ব্যবস্থা? কারণ কিমো-পেশেন্টরা তো চিরকাল পরচুলো পরবে না, কয়েকমাস মাত্র। এমনিতে পরচুলোর বেজায় দাম এদেশে। তাই সাময়িক ব্যবহারের উইগ ওরা সস্তাতেই বানায়। কিন্তু সে সস্তাও আবার আমাদের কাছে কম দামী নয়। সর্বনিম্ন দাম চল্লিশ ডলারের নিচে নয়। ফ্রিডা আগেই এসব খোঁজখবর নিয়েছে। আমি বলি, তিনচার মাসের জন্য অত খরচ করার কি দরকার? না হয় থাকলামই কয়েকমাস ন্যাড়া মাথায়? কি আসে যায় তাতে?

এসব আলোচনা হয়েছে চুল সব প'ড়ে যাবার আগে। এখন এরকমভাবে গোছা গোছা চুল উঠে মাথাটা ন্যাড়া বেল-তিড়িঙ্গা দেখাচ্ছে — সেটাতে জামীর বোধহয় মনে কষ্ট হয়েছে। সে আবার কথা কম বলে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে আস্তে ক'রে বলল, 'মা, উইগ্ একটা কেনো তুমি।'

উইগ কিনেও তো ঝক্কাট কম নয় দেখি। উইগ মাথায় সাঁটার খানিকক্ষণ পরেই ন্যাড়া চাঁদি এমন চুলকোনো শুরু করে যে, উইগ মাথায় রাখাই দুষ্কর। আবার উইগ ছাড়া বাইরে বেরোলেও বিপদ। এখনো মিশিগানে শীত রয়েছে। ন্যাড়া চাঁদি দিয়ে ঠান্ডা লাগার খুবই সম্ভাবনা! শেষে একটা রফা করলাম। বাসার মধ্যে মাথায় রুমাল বেঁধে থাকি, বাইরে বেরোলে উইগ। ধারে কাছে কেউ না থাকলে রুমালটাও খুলে রাখি।

জিভ ও গলার ফুস্কুড়ি ঘা প্রায় ভালো হয়ে এল। সামান্য ভাত, মাছ, সব্জি হাতে পিষে নরম করে খেতে পারছি। বহুদিন পর ঢোকের পর ঢোক পানি গিলে খেতে পারছি। এও যেন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। জীবনে কতোরকমের বৈচিত্র্য যে দেখছি।

এই করতে করতে আবার দ্বিতীয় মাসে কিমোথেরাপী নেবার সময় ঘনিয়ে এল। আবার হাসপাতালে ঢুকলাম। আবার নার্স এসে হাতের শিরা ফুড়ে আই, ভি, সুই লাগিয়ে দিয়ে গেল। ডঃ সামুরী এসে তরলীকৃত প্লাটিনাম পুশ করলেন শরীরের ভেতরে।

এবারে অত বেশি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হ'ল না। তাই হয় সাধারণতঃ। বমিও কম হ'ল, জিভে গলায় ঘা ও কম উঠল।

একে একে দিন কেটে যাচ্ছে। জিভের তলায় ক্যান্সারের গর্ত সবটাই বুজে গেছে। সেখানটা আগের মতোই মসৃন। মুখ ধোবার সময় ওখানটায় আঙুল বোলালে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। কি সব যেন ভেলকি বাজি ঘটে যাচ্ছে আমার জীবনে।

সময় কাটছে আত্মীয় বন্ধুদের কাছে গাদা গাদা চিঠি লিখে, ওদের পাঠানো চিঠি বার বার প'ড়ে। প্রতিটি চিঠিতে কতো ভালোবাসার কথা, মমতার কথা, উদ্বেগের কথা, আশ্বাসের কথা, আশার কথা, আমাকে ওদের প্রয়োজনের কথা। বাদল তার চিঠিতে লিখেছে আপনি আমাদের সকলের চিন্তায় এবং প্রার্থনায় সর্বক্ষণের জন্য আছেন। অতীতে একসময়, যখন আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল, তখন আপনি মায়ের মমতায় আমাদের সবাইকে ধারণ করে ছিলেন— সে কথা আমরা ভুলিনি, কখনো ভুলবনা। আমাদের জীবনে আপনার প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি। আপনি সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন - - - এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

লালু, বেলু, ধলু পুরনো কথাই রিপিট করে —বাবা মা নেই, ভাইরা বিদেশে, বুবু তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন মুরুব্বি নেই। তোমাকে ভাল হয়ে ফিরে আসতেই হবে।

এইসব চিঠিগুলি আমাকে আবার নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়। চোখের সামনে দেখি জামীকে, ফ্রিডাকে। ওদের এখনো কোন সন্তান হয়নি। আমার এখনো নাতি নাতনি দেখা হয়নি। ওরা এবং ওদের অনাগত সন্তান আমাকে আবার নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়।

ঢাকা থেকে কিছু পত্রিকাও পাচ্ছি ডাকে। শাহ্‌দত পাঠাচ্ছে বিচিত্রা, গাজী পাঠাচ্ছে সচিত্র সন্ধানী। আমি ঢাকা ছাড়ার পরের সপ্তাহ থেকেই পাঠাচ্ছে, প্রতি সপ্তাহে এয়ার মেইলে প্রচুর ডাকটিকেট খরচ করে পাঠাচ্ছে। এত অসুখের মধ্যে পত্রিকা দুটোও আমার মনোবল জিইয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

তৃতীয় কিমো থেরাপী নেওয়া শেষ হ'ল ১৮মে। এবারে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আরো কম। বমি, খাবারে অরুচি ছিল বটে, তবে খুব কম। আর মজার কথা, জিভে গলায় ফুস্কুড়ি ঘা একেবারেই ওঠেনি। বোঝা যাচ্ছে, শরীরও এতদিনে কিমো-তে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। ডাঃ ম্যাকিন্টশ মুখের ভেতরের অবস্থা দেখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। ক্যান্সারের গভীর গর্ত সম্পূর্নভাবে বুজে গিয়ে আগের মতোই মসৃন হয়ে গেছে। ডাঃ ম্যাকিন্টশ সেই মসৃন জায়গার ওপর দিয়ে আঙ্গুল টিপে টিপে পরীক্ষা করে বললেন, চমৎকার। চমৎকার। কিমো এত সুন্দর কাজ করেছে। তারপর তিনি আসন্ন অপারেশান, তার প্রতিক্রিয়া ও পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন।

অপারেশান একমাস পরে হবে। এবার নিচের চোয়ালের বাঁ দিকের মাড়ি কেটে চোয়ালের হাড় চেঁছে জিভের তলার কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে আবার সেলাই ক'রে দিতে হবে। এর ফলে জিভটা একটুখানি আটকে থাকবে। আগের মতো অতখানি নাড়াচাড়া করা যাবে না। নিচের ঠোঁটের সামনের অংশটা একটু বসে যাবে, জিভের আগাটা একটুখানি বেরিয়ে থাকবে। অর্থাৎ মা-কালীর মতো চেহারা হবে।

আমার মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য এইটুকু খবরই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু না, আরো দুঃসংবাদ আছে। ডাক্তার বললেন, 'এই অপারেশানে তোমার বাঁদিকের পাঁচখানা দাঁতও ফেলে দিতে হবে। তুমি জীবনে আর কোনদিন চিবিয়ে খেতে পারবে না।'

হ্যাঁ, তিনি ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করলেন। You will never be able to chew again. মাড়িহীন অসমান চোয়ালে নকল দাঁত ও বসানো যাবে না।

এই নিষ্ঠুর সত্যটা আমাকে যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আর কখনো চিবিয়ে খেতে পারব না? ৮২ সালের অপারেশানের পর এই চারবছর মাত্র পাঁচখানা দাঁত দিয়ে কোনমতে চিবিয়ে খেয়েছি। অন্য সবার মতো পুরো দাঁত দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে পারিনি ঠিক, তবু তো চিবিয়েছি কোনমতে। এখন তাহলে কি হবে?

ডাক্তার কিছু যেন চিন্তা করছিলেন, তার মুখটাও গম্ভীর। অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লিকুইড খাবে। নরম খাবার পিষে গিলে খাবে।'

তাঁর বাক্যের শেষ অংশটুকু আমার মাথায় ঢোকেনি। শুধু ঐ প্রথম অংশ 'লিকুইড খাবে।' কথাটা আমার চৈতন্যে যেন বোমার মতো বিস্ফোরিত হ'ল। লিকুইড খেয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে? যে দেশের খাদ্য তালিকায় এত রকমের পিঠে, পুলি, মোয়া, নিমকি, কোপ্তা, কাবাব, মোরগ-মুসল্লম, সিঙ্গাড়া, কিচুরি, গলদা চিংড়ির মালাইকারি, রুই মাছের মুড়ো—সেই দেশের মানুষ হ'য়ে কেবলমাত্র তরল খাবার খেয়ে বাঁচতে হবে? কি ক'রে আমার মতো ভোজন বিলাসী মানুষকে?

কিন্তু উপায় নেই। অপারেশান না করলে ক্যান্সার সেলের মূলোৎপাটন করা যাবে না। ক্যান্সার সেল নির্মূল না হলে আমি বাঁচব না।

ডাঃ ম্যাকিন্টশ আরো অবহিত করলেন, অপারেশানের পর প্রথম প্রথম কথা বলতে পারবেন না। তবে আস্তে আস্তে পরে পারবে, যদিও কিছুটা জড়তা চিরকালই থেকে যাবে। দরকার হ'লে স্পিচ ট্রেইনিং দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

বাঃ। ভবিষ্যতের কি উজ্জ্বল চিত্র।

এবার অপারেশনের আগে একটি সমস্যা দেখা গেল। তিনমাসে তিনবার হাসপাতালে সাতদিন ক'রে দুই হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত জায়গা শিরা ফুঁড়ে ফুঁড়ে কিমোথেরাপী দেবার ফলে দুই হাতে আর ফুড়বার মতো শিরা নেই। দুই হাত জুড়ে কালশিটে প'ড়ে গেছে। অথচ অপারেশানের আগে শিরা ফুঁড়ে স্যালাইন, গ্লুকোজ -রক্ত ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা অজ্ঞান করার আগেই করতে হয়। ডাক্তার ব্যবস্থা দিলেন, কণ্ঠার হাড়ের নিচে একটা মোটা শিরা ফুঁড়ে আই, ভি দেওয়া হবে। এজায়গায় ফোঁড়ার একটা বাড়তি সুবিধে হ'ল এই যে —এই শিরাটা হাতের শিরার চেয়ে অনেক মোটা, এটায় একবার ফুড়লে একমাস অবধি সুই রাখা যায়। আর হাতের শিরা সরু বলে ওখানে একবার ফুঁড়লে তিনদিনের বেশী সুই রাখা যায়না, জায়গাটা ফুলে যায়। খুলে সরিয়ে অন্যত্র ফুঁড়তে হয়। তৃতীয় বার কিমো দেবার সময় আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে যেখানেই সুই ঢোকানো হয়, এক দেড়দিনের মধ্যে ফুলে যায়। সাতদিনে পাঁচ বার সুই নাড়াতে হয়েছিল। আর ব্যথার কথা নাই বা বললাম। কণ্ঠার নিচে সুই ফোঁড়ানোর আরো একটা সুবিধে, এতে দুটো হাতই মুক্ত থাকে। হাতে আই, ভি থাকলে সেই হাতটা সুই, নল এসব সহ নাড়াচাড়া করতে খুব অসুবিধে। এখন দুটো হাতই সমানে ব্যবহার করা যাবে।

হাসপাতালে ভর্তি হবার পরে, অপারেশানের আগের রাতে এক ডাক্তার এলেন এই শিরা ফুঁড়তে। সাধারনতঃ হাতের শিরা ফোঁড়েন নার্স। কিন্তু কণ্ঠার নিচের শিরা ফোঁড়ানোর ব্যাপারটা জটিল ব'লে ডাক্তার ছাড়া কেউ ফোঁড়েন না। ডাক্তার ফুঁড়তে এসে প্রথমেই বলে নিলেন, 'দেখ, এ পর্যন্ত আমার হাতে ঘটেনি। তবে ঘটবেনাই যে এমন কথা তো জোর দিয়ে বলা যায় না। তাই আগেই বলে নিচ্ছি। এই শিরা ফোঁড়ানোর সময় সুইটা হঠাৎ ফুসফুসে বিধে যেতে পারে'

অ্যাঁ, বলে কি? আমি ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, 'তাহ'লে কি হবে? '

'তারও চিকিৎসা আছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি শিরা ফোঁড়ানোর পর এক্সরে নিয়ে দেখব, লাংসে ফুটো হয়েছে কিনা।'

আমি দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে আধা-মূর্ছিতের মতো বিছানায় প'ড়ে রইলাম। বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। ডাক্তাব তার সুই শানাতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, ফাঁসীর আসামীর কি আমার মতো এইরকম মনোভাব হয় মঞ্চে ওঠার পর?

সুই ফোটাতে হয়তো পাঁচ দশ সেকেণ্ড লেগেছিল, আমার মনে হ'ল অনন্ত কাল ধ'রে নরকযন্ত্রণা ভোগ করলাম। না, গায়ে কোন ব্যথা লাগেনি, ডাক্তার আগেই ছোট্ট একটা ইনজেকসন দিয়ে জায়গাটা অবশ ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু বুক ধড়ফড়ানি আর মানসিক ভয় ভীতি প্রায় অসহ্যের পর্যায়ে। এদেশের ডাক্তারদের অপ-চিকিৎসা মামলার ভয় কি এতই বেশী যে প্রত্যেকটি কার্যকলাপের আগে তারা রোগীকে এরকম মানসিক যন্ত্রনা দিয়ে থাকে?

সুই ফোটানোর মিনিট বিশেক পরে ঘটাঘট ঘটাঘট শব্দে প্রায় ছাদ –ছোঁয়া এক বিরাট এক্স-রের মেশিন ঠেলে এক টেকনিশিয়ান কেবিনের ভেতর এসে ঢুকল। এক্স-রে বিল্ডিং একতলায়। আমার কেবিন সাততলায়। কষ্টার নিচে এই সুই ফোটানোর পর আমার নড়াচড়া বা উঠে বসা নিষেধ। তাই চাকার ওপর বসানো এই দৈত্যাকৃতি মেসিনটাই লিফটে চ'ড়ে সাততলায় এসে হাজির।

এক্স-রে নেবার আধঘন্টা পরে ডাক্তরটি এসে সবগুলো দাঁত বের ক'রে হেসে বলল, 'তোমার লাংস-য়ে সুই বেঁধেনি।'

আগামী কাল সকাল নটার সময় আমার অপারেশান। ঘুমের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও সারারাত আমার এককোঁটা ঘুম এ'ল না। শুয়ে শুয়ে গত একমাসের কথা ভাবতে লাগলাম। এই অপারেশানের পর জীবনে আর কখনো চিবিয়ে খেতে পারব না। তাই চিবিয়ে খাবার যতো প্রিয় জিনিস আছে, সব বেশি বেশি ক'রে জামী ফ্রিডা খাইয়েছে গত একমাসে। ড্রাইরোস্টেড্ কাজু বাদাম খেতে ভালবাসি। জামী শিশি-ভর্তি উৎকৃষ্টমানের কাজুবাদাম নিয়ে এসেছে। ম্যাকডোনাল্ডের হ্যামবার্গার খেতে ভালবাসি, সেখানে ঘনঘনই গেছি। পিৎজা খেতে পছন্দ করি। জামী প্রায় অফিস ফেরত রোমানক কিবা লিটল সিজারের গরম পিৎজার বাক্স হাতে ক'রে বাসায় এসেছে। এখানে বড় চিংড়ির আকাশ – ছোঁয়া দাম। তাও জামী ফ্রিডা একদিন এক দামী রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। আজ তিনটের সময় বাসা থেকে বেরোবার আগে শেষ বারের মতো একমুঠো কাজু বাদাম চিবিয়ে এসেছি।

এ রাতে ঘুম না হওয়ার আরো একটা কারণ আছে। এবার আমি সিঙ্গল কেবিন পাইনি। ডাবল কেবিনে এসেছি। আমি যে সময় আসি, প্রায়ই একই সময়ে অন্য বেডের রোগী এক ভদ্রমহিলা ঢাউস এক সুটকেস এবং স্বামীসহ এসে ঢুকলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই মধ্যবয়স্ক । স্বামীটি লম্বা পাতলা, অত্যন্ত কেতাদুরস্ত। স্ত্রীটি দোহারা গড়নের। অত্যন্ত সুন্দরী এবং চেহারায় আদুরে ভাব। ভদ্রলোক এসেই দুই বেডের মাঝখানের পর্দাটা সাঁৎ করে টেনে দিলেন। তারপর সুটকেস খুলে কাপড় চোপড় বের করে ক্লোজেটে রাখতে লাগলেন, সেটা এপাশ থেকে বোঝা গেল। স্ত্রীটি ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। কাজ যা করার স্বামীটি করছিলেন। বেশ অনেকক্ষণ পরে স্বামীটি পর্দাটা আবার সাঁৎ করে অপরপাশে গুটিয়ে দিলেন। অবাক হ'য়ে দেখলাম, বউটি ইতিমধ্যেই পোশাক পালটে অতি সুন্দর এক নাইট ড্রেস পরে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন, বুক পর্যন্ত কম্বল টানা, গলার কাছে দামী নাইট গাউনের চমৎকার লেস দেখা যাচ্ছে। স্বামীটি আমাদের দিকে মুখ ক'রে একপা এগিয়ে এসে বললেন, গুড আফটারনুন এভরিবডি। আমার নাম – – – অমুক। ইনি আমার স্ত্রী, ঐর অপারেশানের জন্য এখানে আসা। আমরা সবাই কুশল বিনিময় করলাম। ভদ্রলোকের চেহারায় কথা বার্তায় চলাফেরায় কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব। নিশ্চয় উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদে সমাসীন কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি। পরিচয়ে তাই জানা গেল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে ভদ্রলোক বাড়ি চলে গেলেন। জামী ফ্রিডাও একসময় বিদায় নিয়ে বাড়ি গেল। দুই বেডের মধ্যবর্তী পর্দা গোটানোই ছিল। কিন্তু দুচারটে মামুলী কথাবার্তা

ছাড়া ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ তেমন জমলনা। স্বামী চলে যাবার পরপরই তিনি ঘরের দেয়ালে ঝোলানো টিভি বেডসুইচ দিয়ে অন ক'রে সেইমুখো হয়ে রইলেন। দুচারটে যা কথা বার্তা হ'ল তাতে বুঝলাম খুব স্বামী সোহাগিনী রমনী। যা করার স্বামীটিই করেন তিনি কেবল ডলপুতুলের মতো সেজে গুজে থেকে স্বামীর আদর ও যত্ন উপভোগ করেন।

রাত গভীর হতে লাগল। আমার নিজের চিন্তায় যত না ঘুম ব্যহত হ'ল তারচেয়েও বেশী ব্যহত হ'ল পাশের ভদ্রমহিলার সারারাত টিভি খুলে রাখাতে। ডাক্তার যখন আই, ভি, দিতে এসেছিল তখন পর্দাটা টেনে আড়াল করে দিয়েছিল। পর্দাটা সেইভাবেই আছে। কাজেই ভদ্রমহিলা জেগে না ঘুমিয়ে দেখতে পাচ্ছি না। নড়াচড়ারও কোন শব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়লেও বুঝতে হবে, টিভির শব্দ তাঁর ঘুমের সাহায্যই করছে।

বিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম, সিঙ্গল কেবিনের খোঁজ অব্যাহত রাখতে হবে। পাওয়ামাত্রই এঘর থেকে পালাতে হবে।

এবারও আমি সেই একই সাইনাই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি তবে গতবারের উইংগে নয়, অন্য তলায় অন্য এক উইংগের কেবিনে। কিন্তু অশ্চর্যের ব্যাপার, এখানেও ভ্যালেরির সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। ভ্যালেরি এখনো এই হাসপাতালেই কাজ করছে। তবে অন্য উইংগে। কিন্তু খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। বলেগেছে, কোন দরকার হ'লে তাকে যেন খবর দিই। তার প্রমোশন হবার ফলে তার স্বাধীনতা ও খবরদারি করার পরিসর আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। কিন্তু চেহারা সেই একরকমই আছে। একটুও মোটা বা রোগা হয়নি। তাকে বললাম, 'সিঙ্গল কেবিন চাই।' সে হেসে বলল, 'প্রথম খালি কেবিনটাই তুমি পাবে।'

॥১৭॥

দ্যা অপারেশান ওয়াজ সাকসেসফুল বাট দ্যা পেশেন্ট — না, প্রচলিত কৌতুক অনুযায়ী মরেনি, ধীরে ধীরে সেরে উঠছে। এবারের অপারেশানটা গতবারের চেয়ে একটু অন্যরকম। গতবার মুখ ফুলেছিল বটে, কথা বলতেও দুতিনটে দিন কষ্ট হয়েছিল কিন্তু গতবারে জিভটা মুক্ত ছিল। তরল খাবার খেতেও তেমন বিশেষ কষ্ট হয়নি।

এবার জিভের নিচেই অপারেশান, জিভটা মুখের ভেতর সেটে বসে আছে। তার ওপর মুখ ফুলে ঢোল।কথা বলা দূরের কথা, গলা দিয়ে কোন স্বরই ফোটে নি প্রথম ৪৮ ঘন্টা ।

সেই আগের মতো লিখে লিখে ডাক্তার, নার্স, ছেলে, বউয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ।এবার কিন্তু খাওয়ার ভীষণ সমস্যা। নার্স ট্রে-ভর্তি দুতিন রকম ফলের রস আনল, দেখি ট্রেতে একটা প্লাস্টিকের মোটা সিরিঞ্জ। প্রায় দেড়ইঞ্চি ব্যাসের বিঘত খানেক লম্বা। এটা কেন? নার্স বুঝিয়ে দিল এটায় ফলের রস টেনে মুখের ভেতর সিরিঞ্জের নলটা খুব সাবধানে ঢুকিয়ে তারপর সিরিঞ্জের হাতলটা পুশ করে রসটা গলায় ঢালতে হবে। যেমন করে ডাক্তাররা ছোট সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে হাতে পুশ করে। বাঃ বেশ ভালো ব্যবস্থা তো। এরা দেখি সবরকম অসুবিধেরই বিকল্প ব্যবস্থা বের করে রেখেছে। নার্সটি বলল, 'কতোটা করে রস বা পানি খাচ্ছ, তার হিসেব রাখবে। এই যে কাগজ।'

এটা ওরা করেই। কতটা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করছি, তার হিসেব রাখতে হয় এবং কতটা তরলপদার্থ প্রস্রাব হয়ে বের হচ্ছে, তারও হিসেব রাখার জন্য বাথরুমে একটা ছোট পাত্র আছে। সেটা কমোডের ওপর বসানো যায়। সেইটেয় প্রস্রাবের হিসেব রাখতে হয়।

গতবার এ নিয়ে কোন সমস্যা হয়নি, কিন্তু এবার জুস বা পানি গিলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একে তো সিরিঞ্জের নলটা মুখের ভেতর ঢোকানোই কষ্টকর এমনই মুখ ফুলে আছে। তার ওপর, সিরিঞ্জের হাতল চেপে জুস মুখের মধ্যে দিলে সেটা গলার ভেতরে না গিয়ে বাইরে গড়িয়ে চলে আসে। উর্ধ্বমুখ হয়ে থাকলে জুস একটুখানি ভেতরে যায় বটে, কিন্তু তাতে আবার ঘাড়গলা বিষম ব্যথা করে। ফলে পেটে তরলপদার্থ বেশি যাচ্ছে না। নার্স বারে বারে আসে আর রাগ করে বলে, এ কি, কিছুই যে খাচ্ছ না। তোমার তো এত - - - আউন্স প্রতি ঘন্টায় খাওয়া উচিত - - - নার্সের কর্কশকণ্ঠের বার বার অনুযোগে আমি হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে গেলাম, কথা বলতে পারি না। স্বরও ফোটে না যে গোঁ গোঁ করে রাগ প্রকাশ করব, ক্ষিপ্ত হয়ে খস খস করে পুরো একপাতা লিখে ফেললাম, জুস খেতে গেলে কি কি অসুবিধে ও কষ্ট হচ্ছে। তারপর তাকে হৃদয়হীন, অবিবেচক, কর্কশকণ্ঠী ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করে তার কড়া সমালোচনা করলাম। সে যদি আমার অবস্থা না বুঝে এরকম করতে থাকে, তাহলে আমি ডাক্তারের কাছে নালিশ করব এই বলে যে, সে আমাকে মানসিক নির্যাতন করছে। এতসব লিখে তার চোখের সামনে ধরলাম ক্লিপবোর্ডে সাঁটা কাগজটা। আমার দ্রুত হাতের ক্ষিপ্ত কলম-চালনা, রোশকষায়িত চোখের ঘূর্নিত দৃষ্টি, লেখাশেষে নার্সের মুঠি ধরে টেনে এনে লেখাটা দেখানো - - - এই রকম মূকাভিনয় দেখে নার্স বোধহয় বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। লেখাটা পড়ে সে বার বার করে ক্ষমা চাইতে লাগল।

পরদিন সকালেই দেখি ভ্যালেরি এসে হাজির। তার হাতে কয়েকটা সরু লম্বা রাবারের নল। সে প্রচুর পরিমানে জুস খাবার কথা শুরু করতেই আমি আবারো রেগে উঠলাম। সে আমার হাত ধরে বলল, আগে শান্ত হয়ে শোনো আমার কথা। 'আমি তোমার সমস্যার নতুন সমাধান নিয়ে এসেছি। সে একটা রাবারের নলের কিছুটা দৈর্ঘ কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট করল, তারপর নলের একমুখ সিরিঞ্জের প্লাস্টিক নলের মুখে লাগিয়ে দিল। সিরিঞ্জে জুস ভরে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই রাবারের নলটা মুখে পুরে জিভ ও তালু দিয়ে আস্তে চেপে ধরবে। রাবার নলের মুখটা একেবারে গলার কাছ পর্যন্ত যাবে। এবার সিরিঞ্জের হাতল পুশ করো খুব আস্তে। দেখো কি সহজে জুস তোমার গলা দিয়ে নেমে পেটে চলে যাচ্ছে।'

সত্যিই তাই। এ এক আবিষ্কার বটে। কি বুদ্ধি ভ্যালেরির। তাছাড়া, তার এত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সে প্রতিটি রোগীর ব্যক্তিগত সমস্যা গুলির দিকে যথাযথ মনোযোগ দিচ্ছে। আমি খুব কৃতজ্ঞ চোখে ভ্যালেরির দিকে তাকিয়ে কাগজে লিখলাম - A thousand thanks ভ্যালেরি হেসে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে চলে গেল।

এভাবে জুস খেতে পেরে বুঝতে পারলাম, গত দুদিনে প্রায় না খাওয়ার দরুণ বেশ দুর্বল হয়ে গেছি। স্যালাইন-গ্লুকোজ চলছিল বলে শরীরে ডি-হাইড্রেশান হয়নি, এই যা রক্ষা।

দুইদিন, দুই রাত পরে গলা দিয়ে শব্দ বের করতে পারলাম। শুধুই শব্দ। কোন কথা নয়। তবু স্বস্তি। কথা বলতে না পারি। গোঁ গোঁ করে রাগ তো প্রকাশ করতে পারব। সেইটেই বা কম কি।

শরীর খুব দ্রুত সেরে উঠছে। ডাঃ ম্যাকিন্টশ দেখেন আর বার বার এক কথাই বলেন, আশ্চর্য তোমার শরীরের নিরাময় ক্ষমতা, এত তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, এমনটি খুব কম রোগীরই দেখেছি। তোমার মধ্যে প্রাণশক্তি প্রচণ্ডভাবে প্রবল।

দশ দিন পরে কণ্ঠার নিচের সেই গ্লুকোজ-স্যালাইনের সুই খুলে দিল। আগামীকাল আমি বাড়ি যেতে পারব। জিভের নিচে এখনো গজ পেঁচানো আছে। এটি দ্বিতীয় দফার গজ। অপারেশানের পর যে গজ দেওয়া ছিল, সেটি পাঁচ ছয় দিন পরে খুলে দেওয়া হয়। খোলার সময় সে কি ব্যথা। অপারেশানের সময় তো অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে অসাড় করে নেয়, কিছু টের পাই নে। কিন্তু পরবর্তীতে এই রকম ছোটখাটো ড্রেসিংয়ের সময় যা ব্যথাটা লাগে, সেটাও কম নয়। আগামী কাল বাড়ি যাবার আগে এই গজটা খুলে দেবে।

হাসপাতাল ছাড়ার আগ দিয়ে ভ্যালেরি দেখা করতে এল। সে আমাকে নতুন সিরিঞ্জ আর সেই সরু লম্বা রাবারের নল তিনচারটে করে দিল। আর সুভেনির হিসেবে একটা নতুন হস্পিটাল গাউন।

গতবারের চেয়েও অনেক বেশি ফুলের তোড়া, গেটওয়েল কার্ড, টেলিগ্রামের কপি – এসব নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরেই প্রথমে ঢুকলাম বাথরুমে, সেখানে বেসিনের সামনে বিরাট আয়না আছে। আয়নার ওপরে দেয়ালে জোরালো বাতি। এতদিন গজ পোরা ছিল জিভের নিচে, চেহারাটা কেমন হয়েছে, বোঝার উপায় ছিল না। মুখটাও ফোলা ছিল।

আয়নায় চেহারা দেখে কেঁদে ফেললাম। বুকটা যেন ভেঙে যেতে লাগল দুঃখে। এই রকম বীভৎস চেহারা হয়েছে আমার? কোন পাপে? কি পাপ করেছিলাম যে আমার এমন হ'ল? সেই যে ছোটবেলায় শহরের কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বিকৃতমুখ ভিখিরিটাকে দেখে ঘেন্না লাগত, সেই পাপে? সেই যে পরিণত বয়সে স্বামীর এক বন্ধুর হাতে একজিমার মতো ঘা দেখে মনে মনে ঘেন্নায় শিউরে উঠেছিলাম, যেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হয়তো মনে মনে দুঃখও পেয়েছিলেন, সেই পাপে কি? এখন যে আমার এমন জিভ বের হয়ে থাকা চেহারা দেখে লোকে ঘেন্না করবে, মনে মনে শিউরে উঠবে। আমি বাঁচব কি করে?

ঢুকেই বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। জোরে বেসিনে পানির কল ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। অনেকক্ষণ পর মুখ ধুয়ে মুছে শান্তভাবে বেরিয়ে এলাম। জামী ফ্রিডা নিশ্চয় টের পেয়েছিল। কিন্তু তারা যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব করে, ঘরের কোথায় কোথায় ফুলগুলো, কার্ডগুলো রাখবে তাই নিয়ে উচ্চকণ্ঠে আলাপ করতে লাগল।

দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। এখনো পরিষ্কার করে কথা বলতে পারি না। দু চারটে ছোট ছোট বাক্য বলি, বাকিটা লিখে কাজ চালাই। এখনও সিরিঞ্জ দিয়েই খাওয়া চলছে। তবে খাওয়ার পরিমান ধীরে ধীরে বাড়ছে। কয়েকদিন পরে কাপে চুমুক দিয়ে সুপ মুখে নিয়ে গিলতে পারলাম। বাড়িশুদ্ধ সবার সেকি উল্লাস। যেন কি একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছি।

আরো কয়েকদিন পর ফ্রিডা একদিন ভাত, তরকারি, নরম করে সেদ্ধ গোশতের টুকরো সব একসঙ্গে ব্লেণ্ডারে ব্লেণ্ড করে দিল। সেই ঘন মণ্ড চামচে করে মুখের ভেতরে দিয়ে গিলে গিলে খেতে পারলাম।

যদিও ঘন মণ্ড করা, তবু তো ভাত তরকারি গোশতের স্বাদ পাচ্ছি। আর কদিন পরে ব্লেণ্ড করারও দরকার হ'ল না। ভাত, মাছ, তরকারি আঙুলে পিষে নরম করে, খুব ছোট ছোট লোকমা বানিয়ে, গিলে গিলে খেতে শুরু করলাম।

ডাঃ সামুরী যেমন বলেছিলেন, কিমোথেরাপী বন্ধ করার মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল আমার মাথার খুলিতে অসংখ্য কালো কালো ফুটকি। অর্থাৎ চুল গজাচ্ছে।

এখন কথা ক্রমশঃ বলতে পারছি। যথেষ্ট জড়ানো, কিন্তু যারা শোনে, তারা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মোটামুটি বুঝে নেয়। টেলিফোনে অবশ্য এখনো কেউ বুঝতে পারে না। ডাঃ ম্যাকিন্টশ বলেছেন, সব সময় কথা বলবে। যত বলবে তত জিভের আড় ভাঙবে, তত কথা পরিষ্কার হবে।

আমি খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, গোসল করছি, পোশাক বদলাচ্ছি, জামী ফ্রিডার সাথে গল্প করছি, ভাই, ভাই বৌ, বেয়াই, বেয়ান যারা বেড়াতে আসছে, তাদের সাথেও কথা বলছি, দাওয়াতে যাচ্ছি — সবই করছি; কিন্তু মনের অশান্তি ঢাকতে পারছি না। খুব আপন যারা, তাদের কাছে বলেও ফেলছি আক্ষেপের কথা। ফ্রিডা, জামী জো শামু সবাই আমাকে বোঝায়, সান্ত্বনা দেয়—তুমি যতটা ভাবছ, ততটা খারাপ মোটেই তোমাকে লাগছে না। এর চেয়ে কতো বিভৎস চেহারার লোক পৃথিবীতে বেঁচে আছে। তোমার চুলগুলো কি সুন্দর হয়ে বেরোচ্ছে। তোমার স্বাস্থ্য কতো চমৎকার হয়েছে। ওরা যতই বলুক, আমার মনে প্রবোধ মানে না। ভাবি, ওরা আমার আপন জন, ওদের কাছে তো আমার চেহারা খারাপ লাগবে না। কিন্তু অল্প পরিচিত প্রতিবেশী, অপরিচিত যে কেউ আমাকে দেখলে নিশ্চয় মনে মনে ঘেন্নায় শিউরে উঠবে।

এই অশান্তি আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। আমার রাতের ঘুম নষ্ট হল। দিনের স্বস্তি চলে গেল। আমি বাড়ির বাইরে চারপাশে একা আপন মনে হেঁটে বেড়াই আর ভাবি এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল ছিল না কি?

এখন আগস্ট মাসের উজ্জ্বল রোদ চারদিকে। ভরা গরম। এখানকার লোক সামান্যতম সুতিবস্ত্র পরে মহা আনন্দে গ্রীষ্মের রৌদ্রসুখ উপভোগ করছে আর আমি এই একই রোদে একটা কার্ডিগান গায়ে দিয়ে হাঁটি। এদের সামার আমার কাছে ঢাকার নভেম্বরের তাপমাত্রা।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রতি সপ্তাহে একবার ক'রে ডাঃ ম্যাকিন্টশের চেম্বারে যাই চেকআপের জন্য।

এরমধ্যে ডাঃ সামুরীর চেম্বারে আর যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর কাজ শেষ হ'য়ে গেছে শেষবার কিমোথেরাপী দেবার পর। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা হার্দিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। চেম্বারে যতবার তাঁকে দেখিয়েছি, একবারও তিনি কি তো নেনই নি, হাসপাতালে থাকাকালীনও ডাক্তার হিসেবে তাঁর যে প্রাপ্য কি,

সেটাও তিনি নেননি। তাঁর চেম্বারের নার্সগুলিও খুব হাসিখুশি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোগীদের সঙ্গে দুচারটে কথাবার্তা বলে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

কিভাবে ডাঃ সামুরীর বদান্যতার প্রতিদান দেওয়া যায় - - - ভাবতে ভাবতে ফ্রিডা এরই মধ্যে দুদিন কেক বানিয়ে চেম্বারের সবার খাওয়ার জন্য দিয়ে এসেছে। আর ডাঃ সামুরীকে উপহার দেবার জন্য সে নিজের হাতে একটা আফগান বুনেছে। 'আফগান' হল একধরনের উলের চাদর। মোটা উল আর মোটা ক্রোশের কাঁটা দিয়ে বুনতে হয়, আকার একটা বড় চাদরের মতো হয়। এদেশের লোকেরা নানাভাবে আফগান ব্যবহার করে। সোফার পিঠে ছড়িয়ে রাখে, বিছানায় বেড কভার হিসেবে পেতে রাখে, খুব শীতে সোফায় বসে টিভি দেখা/গল্প করার সময় পায়ের ওপর মেলে রাখে। তো তিনরঙা উল দিয়ে ফ্রিডা এইরকম একটা আফগান বুনেছে একমাস ধরে, ডাঃ সামুরীকে উপহার দেবার জন্য।

আমি হাসপাতাল থেকে ফেরার পর একদিন ফ্রিডা ডাঃ সামুরীকে ফোন করে জানাল আমি ফিরে এসেছি, অপারেশান সাকসেসফুল হয়েছে এবং আমি ক্রমশঃ সেরে উঠছি। সামুরী অবশ্য আগেই ডাঃ ম্যাকিন্টশের ফোনে জেনেছেন আমার সব খবর। এই দুই ডাক্তার প্রথম থেকেই পরস্পরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিলেন আমার চিকিৎসার ব্যাপারে। তবু ফ্রিডার ফোন পেয়ে তিনি খুশি হলেন এবং বললেন, আমাকে নিয়ে শীগগীরই একদিন ওঁর চেম্বারে যেতে। উনি আমার একটা কমপ্লিট ব্লাড ওয়ার্ক করবেন। রক্তের সবরকম পরীক্ষা করার কাজটাকে ওঁরা কমপ্লিট ব্লাড ওয়ার্ক বলে অভিহিত করেন।

দুতিনদিন পরেই একটা ডেট নিয়ে গেলাম সামুরীর চেম্বারে। ফ্রিডা বিরাট একটা কার্ড-বোর্ড বাকসে আফগানটা রেখে বাক্সটা রঙীন রিবন দিয়ে বেঁধে নিয়েছে।ডাঃ সামুরীর চেম্বারে পৌছোনো মাত্র ডাক্তার নার্স সবাই এমন ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল, যেন কতোকালের হারিয়ে যাওয়া আপনজন ফিরে এসেছে। আমার খুব ভালো লাগল। ডাঃ সামুরী আমার ইঞ্চিখানেক বড় চুলে হাত দিয়ে বললেন, বাঃ, কি সুন্দর ঘন কালো চুল হচ্ছে আপনার, শুনে সুখী হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে থাকা জিভটার কথা মনে পড়ল। মনে মনে কুঁকড়ে গেলাম। না জানি কি বিভৎস লাগছে। উনি সেকারনেই আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য চুলের প্রশংসা করলেন। ডাক্তার নির্দিষ্ট ঘরে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজের হাতে আমার শিরা থেকে রক্ত নিলেন। এই কাজটা সর্বদাই তিনি নিজের হাতে করেন, কখনো নার্সদের দেন না। এবং এমনই নিপুণ তাঁর হাত, মাত্র একবার সুই ফুটিয়েই তিনি শিরা পেয়ে যান। অন্য অনেক নার্স বা ডাক্তারের মতো দু তিনবার ফুঁড়তে হয় না। রক্ত পরীক্ষা করবার যাবতীয় যন্ত্রপাতি এই ঘরেই থাকে.। নার্স তাঁর হাত থেকে রক্তভর্তি টেস্টটিউব নিয়ে যথারীতি রক্ত পরীক্ষার কাজ শুরু করল। সামুরী টুকটাক এটা ওটা কাজ করতে করতে গল্প করছেন। আমি চেয়ারে বসা, ফ্রিডা আমার পাশেই দরজার ফ্রেমে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো। একপর্যায়ে আমি বললাম, 'আমার চেহারাটা এইরকম হবে আগে বুঝতে পারলে কিছুতেই অপারেশানে রাজি হতাম না। আই হেইট মাই ফেইস নাউ। আয়াম সো আন হ্যাপী।'

ডঃ সামুরী কাজ থেকে মুখ তুলে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, কোন কথা বললেন না। মনে হ'ল তিনি আমার দুঃখের পরিমানটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন।নার্স রক্তপরীক্ষার ফলাফল লেখা কাগজটা সামুরীর হাতে দিল। সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার হেমোগ্লোবিন বড্ডো কম এখনো। শ্বেতকণিকা মোটামুটি সন্তোষজনক। তুমি প্রতি পনের দিনে একবার এসে ব্লাডওর্য়াক করিয়ে যাবে।'

কাগজটা হাতে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার যাব আমরা। ডাঃ সামুরী তাঁর মুখটা আমার দিকে এগিয়ে আনলেন। তিনি বিদায় কালে সবসময় আমার কপালে চুমো দিয়ে থাকেন। এখন আমার জিভটা বেরিয়ে থাকে, ভাবলাম ওঁর থুতনিতে ঠেকে যেতে পারে; তাই মুখটা ফিরিয়ে গাল এগিয়ে দিলাম। উনি বললেন, 'নো, আই ওয়ান্ট টু কিস্ দ্য টিপ অব ইয়োর টাং।'

বলে কি। আমি একপা পেছিয়ে যেতেই উনি দুই হাতে আমার কাঁধ ধ'রে দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বললেন, 'নো নো আই স্টিল ওয়ান্ট টু বাইট দ্যাট টাং।'

আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম মুখ কান গরম হয়ে উঠছে। বিব্রত মুখে ফ্রিডার দিকে তাকাতেই দেখি, সে মুচকি মুচকি হাসছে। তার পাশে দাঁড়ানো নার্সের মুখেও দুষ্টু হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি সহজ হ'য়ে গেলাম। সবটাই খেলা। অভিজ্ঞ, সহৃদয় ডাক্তারের একটুখানি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা রোগীর প্রতি। কিন্তু তাতেই রোগীর মন ভালো হ'য়ে গেল। সবাই তাহলে আমার মুখের দিকে চেয়ে ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় মনে মনে শিউরে উঠবে না, কারো কারো মনে সতৃষ্ণ ভাবেরও উদয় হ'তে পারে। আজ বুঝছি, এই বোধটা আমাকে মস্তো একটা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার হাত থেকে রক্ষা করেছিল সে সময়।

॥১৮॥

আমার মনটা স্ফূর্তিতে রাখবার জন্য কতো যে আয়োজন ফ্রিডার।আমার অসুখটাকে মনে হয় সে একটা প্রোজেক্টের মতো ক'রে নিয়েছে। চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে মোকাবেলা করছে। আমি যতো অসুস্থই হই, সেবা করতে পেছ পা হবে না; যত অসুখী, অশান্ত হই না কেন, সে আমার মন ভালো করার জন্য, মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করে যাবে। মনে পড়ে ৮২ সালে হাসপাতাল থেকে যেদিন বাড়ি আসি সেদিনের কথা। বাড়ি ফিরে বেডরুমে ঢুকে দেখি – – – সুন্দর র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো, রিবন লাগানো একটা প্যাকেট। ওপরে লেখা, 'মামনি, তোমার মন ভালো করার জন্য।'

খুলে দেখি, দুটো ভারি সুন্দর সুতির হাউসকোট। এখন তো ঘাড়ে গলায় অপারেশানের পর প্রায় অকেজো ডান হাত নিয়ে শাড়ি ব্লাউজ ঠিক মতো পরতে পারব না। তাই বাড়িতে সবসময় পরার জন্য এত সুন্দর প্রিন্টেড হাউসকোট। শামুর বউ জোসেফিনও এই রকম বিবেচক মনের মানুষ। আমার অপারেশান হবার ৪/৫ দিন পর সে হাসপাতালেই একটা গিফট প্যাকেট নিয়ে গিয়ে বলল, 'হিয়ার ইজ সামথিং টু চিয়ার ইউ আপ।' খুলে দেখি, সাদা সাটিনের ওপর ছোট ছোট ফুল আঁকা দারুন সুন্দর, দামী এক ড্রেসিং গাউন। পা

পর্যন্ত লম্বা, হাতে গলায় সাদা লেস লাগানো। সেবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর জোসেফিন মুরগীর সঙ্গে সব রকম সবজি মিশিয়ে এমন মজাদার একটা স্যুপ বানিয়ে দিয়েছিল এবং পরিমানে এত বেশি যে বহুদিন ধ'রে খুব আরামে সেই স্যুপ খেয়েছিলাম। মাদুর বউ ডাই-ও আমার জন্য খুব ভাবে। আমি হাসপাতালে থাকাকালে সে প্রতিদিন একটা ক'রে গেট-ওয়েল কার্ড ডাকে পাঠাত। বাড়ি ফেরার পর প্রায় প্রায়ই গাড়িতে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যেত।

এবার তো আরো বেশি মনোযোগ সকলের। এবারের কিমোথেরাপী ও অপারেশানের ফলাফলে মানসিক ভাবে যে খুব বিক্ষিপ্ত আমি, তা সবাই বুঝতে পারছে।

এবছর কিমোথেরাপীর পরে প্রথম চুল প'ড়ে গেল ইস্টার হলিডের আগে আগেই । ইস্টারের ছুটি শুরু হয় এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার থেকে। এর সঙ্গে যোগ হয় শনিরবি দুদিনের সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে এটাও একটা লং উইক-য়েণ্ড।

চুল প'ড়ে যাবার কারণে এবং ক্যান্সারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে আমার মন খুবই দমে আছে। সেজোবোন বেলুর ছেলে রানা ট্রেইনিংয়ে এসেছে ডেটন, ওহায়োতে। তার বউ মীনু আছে বোস্টনে—পি,এইচ ডি করছে। রানার কোন এক সময় মিশিগানে আসার কথা আছে বেড়াতে। ফ্রিডা প্ল্যান প্রোগ্রাম করল যাতে রানা, মিনু ইস্টারের লং উইকয়েণ্ডে মিশিগানে আসে। ছোট বোন ধলুর ছেলে রিচি জর্জিয়ার অ্যাটলান্টায় আছে পি এইচ ডি করার জন্য। তার এ সময় মিশিগানে আসার কোনই প্লান প্রোগ্রাম ছিল না। ফ্রিডা ফোনে তাকেও পটিয়ে পটিয়ে মিশিগান আসতে রাজি করাল। ফ্রিডার ধারণা আমার বোনদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দুটো দিন কাটাতে পারলে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। আসলে হয়েছিলও তাই। এই উইকয়েণ্ডেই শনিবার সন্ধ্যায় আবার নাসিরের সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি। এ বছর নাসির পঞ্চাশে পা দিল, তাই তার বউ লীনা বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় নাসিরের জন্য সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টির আয়োজন করেছে অন্য এক বন্ধুর বাসায়। রানা, মীনু, রিচি এসেছে শুনে লীনা ওদেরকেও পার্টিতে নিয়ে আসতে বলল। সন্ধ্যায় সবাই সেজেগুজে গেলাম। আমি যথারীতি মাথায় উইগটি পরে নিলাম।

এদেশে সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়ার খুব রেওয়াজ। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ছেলেমেয়েরা বাবাকে, সবাই সবাইকে যখন খুশি সারপ্রাইজ পার্টি দিচ্ছে। ৮২সালে আমি ঢাকা যাবার দুদিন আগে ফ্রিডা তার মা'র বাসাতে আমার জন্য এক ফেয়ারওয়েল সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করেছিল।

নাসিরের সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টি বেশ উপভোগ করলাম। রানা, মীনু, রিচির সঙ্গেও দুতিনটে দিন খুব ভালো কাটল।

৩মে আমার জন্মদিন। ফ্রিডার খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে সারপ্রাইজ বার্থডেপার্টিদেয়। কিন্তু এবছর তার মা খুব অসুস্থ, মায়ের বাড়ি ছাড়া আর কোথায় সে আমার জন্য সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করবে। তাই বাধ্য হয়ে বাড়িতেই সোজাসুজি বার্থডে পার্টির আয়োজন করেছিল। তবে একটা ছোট্ট সারপ্রাইজ ফ্রিডা আর জামী দিতে পেরেছিল আমায়— এ বছর ২২জুলাই। জামীর মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়। সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আজ যেন বেশি দেরি হচ্ছে। রাত ১০টায় জামী ফিরল,

জামীর পেছন পেছন আরেকটা মূর্তি। আলম। হাবিবুল আলম। ঢাকা থেকে আলম হঠাৎ এই মিশিগানে কি করছে? তাও জামীর সঙ্গে। জামী তাকে কোথায় পেল?

এটাই আমাকে জামী ফ্রিডার সারপ্রাইজ। একেবারে জেনুইন সারপ্রাইজ। আমি সত্যি সত্যিই এত বেশী অবাক হ'য়ে গেছি যে প্রথম মিনিটখানেক কোন কথাই সরেনি মুখ দিয়ে।

আলম ব্যবসা উপলক্ষে লসএঞ্জেলেস-য়ে এসেছিল, সেখান থেকে ওয়াশিংটন ডিসি যাবে। যাওয়ার পথে সে চেষ্টা ক'রে বিশ ঘন্টার একটা ফাঁক বের ক'রে ডেট্রয়েটে নেমেছে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। লসএঞ্জেলেস থেকে সে ফোনে কথা বলেছিল জামীর অফিসে, তখনি তারা ফন্দি আঁটে আমাকে সারপ্রাইজ দেবার। জামী অফিস শেষে ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে।

এতক্ষণে আমার খেয়াল হ'ল, সারদিনে ফ্রিডার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করেছি। ঘরদোর ঝাড়ামোছা করেছে। সপ্তাহে একদিন 'ক্লিনিং গার্ল' এসে বাড়িসাফ করে দিয়ে যায়; তা সত্ত্বেও ফ্রিডা কেন মাঝসপ্তাহে বাড়ি সাফ করছে কাথাটা মনে যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু এবছর দেখছি ফ্রিডা আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রায় প্রায়ই ছুটি নিচ্ছে। ছুটি নিলে ঘর গোছাবে, তাতে অবাক হবার কি আছে। তারপর রান্নাবান্নাও কিছু বেশি করেছে। তাও সে মাঝে মাঝেই ক'রে থাকে। অন্য সময় বাঙালি রান্না করলে আমাকে প্রায় প্রায়ই দেখিয়ে নেয়, আজ দেখায়নি। ভেবেছি, স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে। এতক্ষণে সব রহস্য পরিষ্কার হ'ল।

রাত দশটায় এসে পরদিন বিকেল ৪টায় আলম ওয়াশিংটন ডি সি গেল। যাবার সময় ফ্রিডা তাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে ঠিক হ'ল। সকালে ফ্রিডা বলল, 'আমরা হাতে একঘন্টা সময় বেশী নিয়ে বেরোব। ডেট্রয়েট যাবার পথে আমরা একটা পুকুরে হাঁসেদের রুটি খাইয়ে তারপর এয়ারপোর্ট যাব।' মিশিগানে লেক আর পুকুর অসংখ্য। পুকুর ও ছোট লেকে অসংখ্য হাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। কেউ এদের মারে না বা ধরে নিয়ে খায় না। বরং লোকে রুটি এনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পানিতে ছুঁড়ে এদেরকে খাওয়ায়। ফ্রিডারও এই অভ্যাস আছে। এবছর আমার মন ভালো করার উদ্দেশ্যে সে প্রায় প্রায়ই আমাকে নিয়ে ডাক-ফিডিং করতে যায়। বড় বড় দুটো পাউরুটি কিনে নেয়, তারপর কোন এক পুকুর বা ছোট লেকের পাড়ে গাড়ি থামায়। আমরা দুজন দুটো বড় পাউরুটি হাতে গাড়ি থেকে নেমে পানির কিনারায় এসে দাঁড়ানো মাত্রই হাঁসগুলো কলকল করতে করতে ছুটে আসে। আমরা পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পানিতে ছুঁড়ে দেই। ওরা কপকপ করে খায়। কেউ কেউ পানি ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। হাঁসেদের রুটি খাওয়াতে খুব ভালো লাগে। পরিবেশটার জন্যও বটে। ঝিরঝির করে পানি বয়ে যাচ্ছে, ওপারে গাছ পালা, এপারেও গাছ পালা—অপূর্ব গ্রীবা ভঙ্গী করা বড় বড় সাদা রাজহাঁস, মেটে চিনা হাঁস, খয়েরি, পাটকিলে, সাদা মেশানো ছোট ছোট হাঁস— কতোরকমের হাঁস সাঁতার কাটছে, ঝিরঝিরে বাতাস বইছে—বড় ভাল লাগে এভাবে কিছু সময় কাটাতে। মন সত্যিই ভাল হয়ে যায়।

আজ আলমের মতো এক ব্যবসায়ীকে- - -যে ব্যবসার কাজে আমেরিকা এসেছে এবং যে আজই দুঘন্টা পরে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিটিংয়ে বসবে- - -তাকে প্লেনে তুলে দেবার পথে ফ্রিডা ডাক-ফিডিং করানোর জন্য পুকুর পাড়ে

নিয়ে গেল, আলমের জীবনে এটা একটা অভিনব অভিজ্ঞতা বটে। আলমের কতটা ভাল লেগেছিল জানিনা, কিন্তু আমি পুরো ব্যাপারটাই খুব উপভোগ করেছিলাম।

তো এইভাবে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। দেশ থেকে চিঠি পাচ্ছি, টেলিগ্রাম পাচ্ছি, টেলিফোন পাচ্ছি, তাদেরকে চিঠি লিখছি, টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি, টেলিফোন করছি। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি। দাওয়াত খাচ্ছি। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে টরোন্টো বেড়িয়ে এলাম মধু-মীনার বাড়িতে। সেপ্টেম্বরে ষ্ট্র্যাটফোর্ট যাব শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতে—একটা সুবিধেমতো উইকয়েণ্ড এখন থেকেই বেছে নেবার চেষ্টা করছি, যে সময়টা আমাদের পছন্দ মতো কোন নাটক অভিনীত হবে। কিন্তু ক্যাকড়া লাগল আগষ্টের মাঝামাঝিতে। বাঁ চোয়ালে আবার ব্যাথা শুরু হ'ল। আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। এক্স-রে করে দেখা গেল চোয়ালের হাড়ে ইনফেকসান হয়েছে। একটা স্টিচ না কাটা অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। ম্যাকিন্টশ স্টিচটি কেটে দিলেন আর অ্যান্টিবায়োটিক খেতে বললেন।

এককোর্স অ্যান্টিবায়োটিক খাবার পরও কিন্তু অবস্থার উন্নতি হ'ল না। ডাক্তার আরো দুসপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক খেতে বললেন। তাতেও ফল হ'ল না। তখন ডাক্তার বললেন, মাড়ির ঐ অংশটা কেটে ফাঁক করে হাড়ের ইনফেকসানটা চেঁছে ফেলে দিতে হবে। হাসপাতালে যেতে হবে না, তাঁর চেম্বারেই হবে। খুব ছোট্ট অপারেশান। বললেন তো ছোট্ট অপারেশান, দুমিনিটেই হয়ে যাবে কিন্তু আমার মনটা বিরক্তি আর রাগে ফুঁসতে লাগল। কতো আর সহ্য করা যায়। নিজের অদৃষ্টের ওপরও প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মাল। কি যে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে আমার জীবনটা নিয়ে। বেড়ালও তো এতটা নিষ্ঠুর খেলা খেলে না ইঁদুর ধরে।

ডাক্তার তার চেম্বারে একদিন মাড়ি কেটে ফাঁক করলেন, হাড়ের ইনফেকসান চেছে সাফ করলেন, তার পর আবার মাড়ি সেলাই করে দিলেন। মিনি অপারেশান হ'লে কি হবে। ছয়টা স্টিচ পড়ল। আবার ছোট্ট একটা ড্রেইনপাইপও লাগানো হ'ল। আবার কদিন লিকুইড খাও। ব্যথার ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক খাও।

এর পরেও কয়েক সপ্তাহ ধরে ভোগান্তি গেলনা। মাড়ি ভাল হয়েও হয়না। ব্যথা হয়। রক্ত পড়ে। ডাক্তারের চেম্বারে যাতায়াত বেড়ে গেল— এই করতে করতে নাটক দেখার সময়ই করা গেলনা। অনেক আগে থেকে তারিখ ঠিক না করলে টিকেট পাওয়া মুশকিল।

এবছর এসেছি মার্চ মাসের পয়লা তারিখে। সেই চারমাসের রিটার্ন এক্সকারসন টিকেট কেটে। আগের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জুনমাসে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে দিয়েছি। তবে এবার আর ডাক্তারকে একবছর থাকার কথা লিখতে দিইনি। বলেছি লিখুন কয়েকমাস মাত্র দেরি হবে। ডাক্তার হেসে তাই লিখেছেন।

ইনফেকসান, ব্যাথা, ফোলা —সব সেরে সম্পূর্ণ ভালো হ'তে হ'তে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এসে গেল।

আগষ্টে যখন মাড়ির ইনফেকসান, ফোলা, কাটাছেঁড়া ব্যথা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, সেই সময় হঠাৎ একদিন পাসপোর্ট খুলে দেখি —আরে। ভিসা তো শেষ হ'য়ে গেছে। অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ফোলা একটু কমতেই ডাক্তারের চিঠি নিয়ে ইমিগ্রেশান অফিসে দৌড়ালাম। অফিসটা আবার ষ্ট্রেয়েটে। এই ইমিগ্রেশান অফিস ভারি খতরনাক একটা জায়গা।

এখানকার অফিসাররা মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করেনা। কতো দেশের লোক যে এখানে ভিড় জমায়, সবাই আমেরিকান ভিসা চায়, আমেরিকায় বসবাস করতে চায়। আমি বাবা তোমাদের এই ছাইয়ের দেশে বসবাসে মোটেই আগ্রহী নই। নেহাৎ দায়ে ঠেকে এসেছি, দায় উদ্ধারের জন্য কয়েকটা বাড়তি দিনের মেয়াদ চাই মাত্র।

আমি যে কাউন্টারে দাঁড়ালাম, সেখানে এক মহিলা অফিসার। তিনি সদয় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিনের ভিসা চাও?'

'পাঁচসপ্তাহ হলেই চলবে।'

পেছনে জামী দাঁড়িয়ে ব্যস্ত গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'যদি না ফুলোয়? আরো বেশি সময় চাও।'

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললাম, 'ওতেই হবে।'

আমার কেন জানি স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল আমি সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সেরে উঠব এবং অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই বাড়ি ফিরতে পারব।

জামী এতদিনে বুঝে গেছে তার মায়ের মন-মানসিকতা। আমি যখন মিশিগানে থাকি, তখন ঢাকার জন্য মন কাঁদে, আবার যখন ঢাকায় থাকি, তখন জামী-ক্রিডার জন্য মন কাঁদে – – – এই দোটানার লোহার শিকলে আমি টানটান বাঁধা।

৫ অক্টোবর আমার যাওয়ার তারিখ ঠিক হল। সন্ধ্যায় ডেট্রয়েট থেকে প্লেনে উঠব। ৬ তারিখ সকালে হীথরো পৌছব। সেখান থেকে ঢাকার প্লেন চোদ্দ ঘন্টা পরে – – – রাতে। সারা দিনটা আমি লিণ্ডা স্বপনের বাসায় থাকব। লিণ্ডার একটি ছেলে হয়েছে আগস্ট মাসে, সেই জন্য তার মা বেলু এখন লণ্ডনে আছে। পাশাও অনেকদিন হয় ফাংকফুর্ট থেকে লণ্ডন চলে এসেছে।

বেলু আর পাশা এয়ারপোর্টে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। কাস্টমস্ পেরিয়ে বাইরের দিকে এগোচ্ছি, মনে নানা ভাবের উথাল-পাথাল। একটা বিষয়ে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি। এয়ারপোর্টের ভাইবোনকে দেখে কিছুতেই কান্নায় ভেঙে পড়ব না। একবার কান্নার বাঁধ ভাঙলে সামলানো মুশকিল হয়।

বাইরে বেরোতেই বেলু আর পাশার মুখোমুখি হ'লাম। জড়িয়ে ধরলাম ওদের দুজনকে। বেলুর মুখ লাল হ'য়ে আছে, অনেকক্ষণ থেকে আবেগ দমন করার চেষ্টার ফল। আমার দিকে চেয়ে হাসি-কান্না মেশানো আকুল স্বরে বলে উঠল, 'তোমার চুল ভারি সুন্দর হয়েছে।'

পাশা তাড়াতাড়ি আমার এয়ারব্যাগটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাড়া-দেওয়া গলায় বলে উঠল, 'চল চল, তাড়াতাড়ি গাড়িতে চল' অর্থাৎ সেও চেষ্টায় আছে যাতে বেলু বা আমি এখানেই কান্নায় ভেঙে না পড়ি।

তাড়াহুড়োর কিছুই ছিলনা, তবু আবেগ আর কান্নাকে তাড়াবার জন্যই বোধহয় এই তাড়াহুড়োর অভিনয়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে উঠতে সামলে নিলাম। বেলুও স্বাভাবিক কণ্ঠে অন্য কথা বলতে লাগল। লিণ্ডার বাচ্চার প্রসঙ্গেই কথাবার্তা চলতে লাগল।

সবাই আমার চুলের প্রশংসা করছে। চুলটা এতদিনে ইঞ্চি তিন-চার লম্বা হয়েছে। চুলের আগাগুলো রিং-এর মতো পুটিয়ে থাকে। ছোট বাচ্চাদের যেমন থাকে। আমার যে

জিভটা বেরিয়ে আছে, এ কান থেকে ওকান পর্যন্ত চোয়ালের নিচ দিয়ে লম্বা কাটা দাগ চামড়া কুঁচকে রেখেছে, গলার ডান পাশে কণ্ঠার কাছটা গর্ত হয়ে আছে - - - এসব দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না বা উল্লেখ করছে না।

করবে না-ই তো। সেই যে গল্প আছে না - - - এক মহিলা দেখতে কুৎসিত, সে একটা সুন্দর শাড়ি পরে তার বান্ধবীকে (স্বামী কিংবা প্রেমিকও হতে পারে ক্ষেত্রান্তরে) জিজ্ঞেস করছে, 'আমাকে কেমন মানিয়েছে বল না।' উত্তরটা এল একটু ঘুরিয়ে, 'শাড়িটা দারুণ তো।' কিংবা সেই যে মহিলা, সুন্দর টি-সেট বের করে চা দিয়েছেন অতিথিকে। জিজ্ঞেস করছেন 'চা টা কেমন হয়েছে, বলুন না।' অতি বাজে চায়ে চুমুক দিয়ে অতিথি জবাব দিচ্ছেন, 'আপনার টি-সেট টা ভারি সুন্দর তো।' এও অনেকটা সেইরকমই ব্যাপার আর কি। কিন্তু কিইবা করার আছে আমার? মেনে নেওয়া ছাড়া? তাই মনের দুঃখ একপাশে ঠেলে চাপা দিয়ে রেখে লিণ্ডার বাচ্চার দিকে মনোযোগ দিলাম, বেলুর কাছে ঢাকার খবরাখবর শুনলাম। বিকেলে সিরাজ, মেরু অফিস ফেরত দেখা করতে এল, সন্ধ্যায় সবাই একসঙ্গে ডিনার করলাম।

আমি লিণ্ডার রান্নাকরা ভাত, মাছ তরকারি সবই আঙুলে পিষে নরম ক'রে খেলাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বেলুকে বললাম, 'বেলু, আমাকে একটুখানি সুজির হালুয়া বানিয়ে দাওতো। প্লেনে যদি সফ্‌টফুড দিতে না পারে, তাহলে এই হালুয়া খেয়ে থাকব।'

ডেট্রয়েটে টিকেটে তারিখ বসাবার দিনে বি, এ কর্মচারীকে বলেছিলাম, 'আমি চিবোতে পারি না, আমার জন্য কি সফ্‌টফুডের ব্যবস্থা করা যাবে?' 'নিশ্চয়। এখনি কম্পিউটারে সফ্‌টফুডের রিকোয়েস্ট জানিয়ে দিচ্ছি। তবে তুমি এয়ারপোর্টে চেক-ইন করার সময় কাউন্টারে মনে করিয়ে দিয়ো।'

তাই দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা ঠিক সফ্‌ট ফুড দিতে পারে নি। হয়তো আসল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে নি।

ক্লিডা বুদ্ধি ক'রে ইয়োগার্টের দুটো ছোট কার্টন ব্যাগে দিয়েছিল, তাই খেয়ে কোনমতে ছিলাম। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় স্টুয়ার্ড অনেক মনোযোগ সহকারে আমার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুঁজে শেষ মেষ দুটো হ্যাক বয়েল ডিম এনে হাজির করল, চিরাচরিত ব্রিটিশ পদ্ধতিতে দুই এগ কাপের ওপর গোটা ডিম বসিয়ে। আমি ডিমের ওপর অংশের খোলা ভেঙে চামচ দিয়ে আধা সেদ্ধ ডিম খেয়ে প্রচুর ধন্যবাদ জানালাম সেই অভিজ্ঞ, সহৃদয় স্টুয়ার্ডকে।

কিন্তু লণ্ডন ঢাকার ফ্লাইটের সময় আরো দীর্ঘ। এতটা সময়ের জন্য রিস্ক্ নেওয়া সুবুদ্ধির কাজ হবে না। সঙ্গে সুজির হালুয়া রাখাই শ্রেয়।

॥১৬॥

এবার ঢাকায় ফেরার পর চিত্ত-বিক্ষোভটা যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি হল। খাওয়া দাওয়ার স্বাধীনতা অনেকটাই খর্ব, জিভ্ বেরিয়ে থাকে, তারওপর এই খাটো চুল।

রূপগর্বে গর্বিতা আমি ছিলাম না কখনো, কিন্তু রুচিসম্মত সাজসজ্জায় স্ত্রিশ্রীর স্তুতির গরবে গরবিনী ছিলাম তো। ছাঁটা চুলের ফ্যাশান কখনই আমাকে সম্মোহিত করতে পারেনি। ষাটের দশকের কাটাহাতের ব্লাউজ ও ছাঁটাচুলের নতুন ফ্যাশান এড়িয়ে সর্বদাই বাঙালী মেয়ের চিরন্তন সাজসজ্জায় নিষ্ঠ থেকেছি - - - খোঁপায় ফুল, কপালে টিপ, হালকা গহনা, ঋতু উপযোগী রঙের শাড়ি। তার জন্য প্রশংসাও পেয়েছি অজস্র, অকুণ্ঠ। একাত্তরের পরে টিপ, ফুল বাদ দিলেও ভূষণ আভরণের বাঙালীয়ানা কখনো ম্লান হয়নি। সেই আমার এই পঞ্চাষোর্ধ বয়সে বয়কাট চুল। মেনে নেওয়া কষ্টকর বইকি।

এবার ফেরার পর আরো একটা নতুন, অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'লাম - - - যেটা সম্বন্ধে আগে কোন ধারণাই ছিল না। আমার 'একাত্তরের দিনগুলি' বইটি ইতিমধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং বইটি পড়ার পর অনেক পাঠকই বাড়ি খুঁজে বের করে খবর নিয়ে গেছে। তারা আমাকে দেখতে চায়। আমি দেশে নেই শুনে অপেক্ষা করেছে। আমি আসার পর তাদের অনেকেই একে একে এসে দেখা করতে লাগল। আমাকে তো চেনে না, আগে দেখেনি কখনো, আমার ভাগ্নের মেয়ে রিমা যখন দরজা খুলে তাদেরকে দোতলায় বসার ঘরে নিয়ে আসে, তারা প্রথমে আমাকে দেখে চিনতে পারে না। রিমা যখন বলে ইনিই - - - তখন তারা একটা ধাক্কা খায় মনের মধ্যে। সেটা তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে। চমকে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'ই নিই?—'

তখন আমার মনে হয় ধরনী দ্বিধা হও। এরা বই প'ড়ে এক সনাতন বাঙালী মাকে দেখবে বলে আশা করে এসেছে। তারবদলে এই খাটো চুলের জিভ বের করা মহিলা। তারা মেলাতে পারে না। অবশ্য মিনিট খানেকের মধ্যেই সামলে নেয়। তারপর বসে সহজ কণ্ঠে কথা শুরু করে। বলে কিভাবে, কতো কষ্ট ক'রে বাড়ি খুঁজে বের করেছে। বইতে লেখা আছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে দুতিনটে গলি পেরিয়েই পলিক্লিনিক। তারা পলিক্লিনিক ধ'রে উল্টো হাঁটতে হাঁটতে এসে বহুজনকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে বাড়ি খুঁজে বের করেছে। এসে শোনে আমি নেই। হতাশ হয়ে চলে গেছে, মাঝে মাঝে এসে বা ফোন করে জিজ্ঞেস করেছে কবে ফিরব।

বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা আসে। কারো কারো বিবাহিত বড়বোন আসে। বাড়ি থেকে মাছ বা পায়েস বা পুডিং বানিয়ে নিয়ে আসে। মন খুব ভালো হয়। কিন্তু ঐযে প্রথম দেখাতে চমকে ওঠে, ওইটেই আমাকে দারুণ মর্মপীড়ায় বিদ্ধ ক'রে। কেন আমার এরকম হ'ল? আরো পরে তো হ'তে পারত? এখন এই যে আমার বইয়ের পাঠক পাঠিকা আমাকে দেখতে ছুটে আসে - - - এই ঘটনা ঘটবার ঠিক আগে আগেই কেন আমার এইরকম অঙ্গ-বিকৃতি ঘটল?

আমার বোনেরা আমাকে সান্ত্বনা দেয়, আমার ছেলে মেয়েরা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। তারা বোঝাতে চেষ্টা ক'রে এই রকম খাটো চুলে আমাকে কতো এলিগ্যান্ট, কতো ব্যক্তিত্বময়ী লাগে দেখতে। শুনে আমি ক্ষেপে উঠি। একদিন শামীম আজাদও ক্ষেপে উঠল আমার ওপর 'জানেন জন্ম থেকে কতো মেয়ে কুৎসিত চেহারা নিয়ে বেঁচে আছে? আপনি তো এতকাল সুন্দরীই ছিলেন, এখনও এত কাটাছেড়ার পরও যেটুকু আপনার আছে, অনেক কুৎসিত মেয়ের তাও নেই।'

শামীমের কথায় ক্ষণকালের জন্য সান্ত্বনা মানি কিন্তু সমস্যার শেষ হয় না। ডিসেম্বরের পয়লা সপ্তাহ থেকেই সাংবাদিকদের ফোন আসা শুরু হয়ে যায়। তাদের পত্রিকার জন্য আমার ইন্টারভিউ নেবে। কখন সময় দিতে পারব? সময় একটা দিই, তারপর তারা বলে ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবে, আমার ফটো তুলবে। আমি আঁতকে উঠি। 'না, না, ফটো তোলা চলবেনা।'

কি সর্বনাশ। এই রকম পরিস্থিতির সঙ্গে আগে তো কখনো মুখোমুখি হইনি। কি ভারি একখানা বই লিখেছি যে এত আদিখ্যেতা করতে হবে? ফটো না ছেপে কি ইন্টারভিউ ছাপা যায় না? না, তারা ফটো ছাপাবেই।

নিরুপায় হয়ে স্বীকারোক্তি করি এইসব ছেলের বয়সী সাংবাদিকের কাছে, এই অসুখের পরে এই খাটো চুলে আমি নিজেই এখনো অভ্যস্ত হতে পারিনি। আমাকে কিছু দিন সময় দিতে হবে সইয়ে নেবার জন্য।

তারা উজ্জ্বল মুখে বলে, বেশ তো, আপনার আগের একখানা ছবি দিন।

আমি মাথা নাড়ি, না, তাও দিতে চাই না। সেটা আরো হাস্যকর হবে।

তাদের মুখ চুপসে যায়, তার পর অন্য আরেকটা সমাধান বের করে ফেলে, বলে, অপারেশানের ঠিক আগে আগে তোলা কোন রিসেন্ট ছবি নেই?

হ্যাঁ, তা আছে।

এবছর ২৮ ফেব্রুয়ারী আমেরিকা রওনা দেবার দুদিন আগে সন্ধানী সম্পাদক ফটোগ্রাফার নাসির আলী মামুনকে পাঠিয়েছিল আমার কিছু ছবি তোলার জন্য। সন্ধানীর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় আমাকে নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী করবে, সেই জন্য। সেই ছবিটাই সবচেয়ে রিসেন্ট। সেটাও প্রথম অপারেশানের পর, কিন্তু চুলগুলো অক্ষত ছিল তখনও। সেই ছবি দিলাম সাংবাদিকদের।

আরো একটা ব্যাপারে মন খুব খারাপ। আমার আনন্দের অন্যতম উৎস ছিল যে ফুলের টব সেই টবগুলো দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। আমার যে বহু বছরের পুরনো মালী ছিল, যে আমার বাড়ীতেই থাকত, সে এবার মারা গেছে। তার জায়গায় অন্য বিশ্বস্ত মালী জোগাড় করতে পারিনি। কাজের লোক নেই, নব্বইটা টবের পরিচর্যা করা অসম্ভব ব্যাপার। টবের বাগান হল ছাদে, সেখানে প্রখর রৌদ্র তাপের জন্য পানি লাগে বেশি, পরিচর্যা লাগে বিশেষ ধরনের। আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা নিজের হাতে বাগান করে, সেইরকম তিনজন শাহাদত, শাহরিয়ার ও বীথিকে টবগুলো ভাগ করে দিয়ে দিলাম। এখন আমার ছাদ ও ড্রয়িংরুম গাছ শূন্য। সারা বছর ধরে ড্রয়িংরুমে পুষ্পিত টব আনাগোনা করত, রজনীগন্ধার তীব্র মধুর গন্ধে, চন্দ্রমল্লিকার মৃদু সৌরভে বসার ঘর আমোদিত হয়ে থাকত, গাঁদার হলুদ আর পয়েন্টসেটিয়ার তীব্র লালে ঘর উদ্ভাসিত হয়ে থাকত ; আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আর মন অনাবিল প্রশান্তি ও আনন্দে ভ'রে উঠত, সেই সুখটুকু থেকেও এবার বঞ্চিত হলাম।

আমার ড্রয়িং রুমের পত্র-পুষ্প-শূন্য ধূসর মরুভূমির মধ্যে বসে থাকি আর মনের মধ্যে শূন্যতার বালুঝড় ঘুরে ঘুরে ওঠে।

এইভাবে দিন গড়িয়ে যায়। শাহ্‌দত, শাহরিয়ার, গাজী এদের তাগাদায় কিছু কিছু লেখা এগোচ্ছে। বাকি সময়টা আত্মীয়, বন্ধু, এবং আমার ছেলেমেয়েদের বাসায় বেড়িয়ে, খেয়ে, আড্ডা দিয়ে কেটে যাচ্ছে।

তিনবোনের বাসায় প্রায়ই যাই পালা করে, সারাদিন থাকি, খাই, তারপর শূন্য বাসায় ফিরে আসি। শাহরিয়ার কবির প্রায় প্রতি শুক্রবারেই তার বাসায় দিন-যাপনের জন্য দাওয়াত করে। নিজের হাতে বাজার করে, কোন কোন সময় নিজের হাতে রান্না করে। আরো একে ওকে খেতে ডাকে। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতে, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করাতে — আস্তে আস্তে আমার মনের জটিলতার গ্রন্থি খুলে যেতে থাকে। শাহ্‌দতের বাড়িতে যখনই কোন ভোজ বা পার্টি থাকে, আমাকে নিয়ে যায়। সেও প্রায়ই আসে আমার বাড়িতে, বেশির ভাগ সময়ে দুপুরে। আসার পথে কোন কোন দিন নিউমার্কেট থেকে জিওল মাছ কিনে নিয়ে আসে। ঠিকে কাজের মেয়ে সকালে কাজ করে চলে যায়। শাহ্‌দত নিজেই বালতি বা ডেকচি বের করে পানি ভরে কই, মাগুর মাছ জিইয়ে রাখার কাজটা করে।

গাজীর বাড়িতে তার মা থেকে শুরু করে, তার বউ, ছেলেমেয়ে তার বোনেরা, ভাইয়েরা, ভাই-বউরা সবাই আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, আমার জন্য কতোরকমের খাবার তৈরি করে, তাদের বিরাট যৌথ পরিবারের যতোরকম বিয়ে-শাদী, জন্ম, বিয়ে বার্ষিকী-জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান হয়, সব কিছুতেই আমাকে যেতেই হয়।

ভাবি, সকলের এত ভালবাসা আমি রাখব কোথায় ?

একজীবনে এত লোকের এত ভালবাসা কেউ কি সহজে পায় ? আমি যে এত পাচ্ছি। এর পরেও আমার মনে এত হাহাকার, এত আর্তি, এত সব-হারানোর দুঃখ কেন ? কি করে এই দুঃখ ভুলে শান্তি পাব ?

দুঃখ ক্রমশঃ ভুলি। আমার বইয়ের পাঠকরাই ভোলায়। চিকিৎসা শেষে ঢাকা ফিরে আসার পরপরই এক পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এঁর নাম মহিউদ্দিন আহমদ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। জেদ্দায় থাকাকালীন সচিত্র সন্ধানীতে আমার লেখা পড়েন। ঢাকায় বদলি হয়ে এসে বই কিনে নিজেও পড়েন, সহকর্মী বন্ধু বার্মার রাষ্ট্রদূত মুস্তাফিজুর রহমানকেও একখণ্ড কিনে পাঠান।

মুস্তাফিজ ঢাকায় ট্যুরে এসে মহিউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাসায় আসেন আলাপ করতে। এইরকম সব হোমরা চোমরা মানুষ আমার বই পড়ে এত অভিভূত, দেখে আমি নিজেও অভিভূত এবং মুগ্ধ। মুস্তাফিজ আবার বলেছেন, এই বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা উচিত। আপনি কি এবিষয়ে চিন্তা করেছেন ?

'না, করিনি। কে অনুবাদ করবে ? আপনি করবেন ?'

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও সামলে উঠে মুস্তাফিজ রাজি হয়েছেন। আমি ভাবি, আমার সৌভাগ্য। বই বেরুতে না বেরুতে তার ইংরেজি অনুবাদেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। মহিউদ্দিন এবং মুস্তাফিজ দুজনেই একাত্তর সালে বাংলাদেশের পক্ষে ডিফেক্ট করেন। মহিউদ্দিন তখন লণ্ডনে ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে সেক্রেটারী, মুস্তাফিজ

নেপালে সেক্রেটারী। দুজনের মনেই স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা এখনো জ্বলজ্বল করে। সেইজন্যই তাঁরা এই বইটিকে এত মূল্য দিয়েছেন।আমার মনের ভার হালকা হতে থাকে।

বইটি বেরোনোর সাত আট মাস পরেই প্রথম সংস্করণ শেষ। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল ডিসেম্বরে। বছরঘুরে আবার ফেব্রুয়ারী মাস এল, আবার বইমেলার উদ্বোধনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিছুতেই যেতে পারলামনা। গেলেই তো সব পরিচিত মানুষের অবাক দৃষ্টি পড়বে আমার ঝাটোচুল আর ক্ষতবিক্ষত মুখের ওপর। জনে জনে জিজ্ঞেস করবে, 'ওমা, একি চেহারা হয়েছে আপনার। (কিংবা তোমার)। কি অসুখ হয়েছিল ?' না, সে আমি সইতে পারব না।

কিন্তু বইমেলা আমাকে প্রবলভাবে টানতে লাগল। কয়েকদিন পর প্রচুর সাহস সঞ্চয় করে গেলাম বিকেল চারটের দিকে। এই সময় মানুষের ভীড় পাতলা থাকে। গিয়ে খুব ভাল লাগল। বিভিন্ন স্টলে ঘুরে বেড়ালাম। পরিচিত লোকের সাথে খুব কমই দেখা হল। সেটাই আমার কাছে স্বস্তির ব্যাপার।

প্রথম দিন গিয়ে সংকোচের বাঁধটা ভেঙ্গে গেল। এরপর প্রায় প্রতিদিনই যাই। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকি। পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। সাইয়ীদ আতিকুল্লাহ ভাই মেলার খাবার স্টলে বসে আড্ডা দেন। আমিও তাঁর সঙ্গে বসে থাকি। আমার চারপাশে জন-রাশি থৈ থৈ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিকরা আসেন। ইন্টারভিউ নেন, ছবি এখনো তুলতে দিই না। কিন্তু মনে মনে ভাবি – এভাবে কতোদিন চলবে ? বাস্তব সত্যকে একদিন মেনে নিতেই হবে। গাজী প্রায়ই বলে, 'খালাম্মা নাসিরকে পাঠাই ? কয়েকটা ছবি তুলুক।' আমি রাজি হইনা। কিন্তু সামনে আবার স্বাধীনতা-দিবস আসছে। আবারো ইন্টারভিউ। কতো আর আগের তোলা ছবি দেব ? ঢাকার মানুষ তো এতদিনে আমার জিভ বের করা, ঝাটো চুল ওয়ালা চেহারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর ছবি তুলতে এত আপত্তির কি আছে ?

অবশেষে রাজি হই। নাসির আলী মামুন মার্চের মাঝামাঝি একদিন আসে বাসায়, আমার ছবি তোলে পুরো এক রিল।

।।২০।।

একাত্তরের দিনগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে গেল মাত্র চারমাসে। অবশ্য একুশের বইমেলা ছিল বলেই এত অল্পসময়ে এত বিক্রি হয়েছে। বইমেলায় মানুষে যেন নেশা-গ্রস্ত হয়ে বই কেনে। এপ্রিলে তৃতীয় সংস্করণ বেরোল। খুব খুশি লাগছে।

আরো একটা ব্যাপারে খুশি লাগছে — আমার বধূ-মাতা অন্তঃসত্ত্বা। বিয়ের আটবছর পরে এই প্রথম সন্তান আসছে। যে নাতি বা নাতনির লোভ দেখিয়ে ছিডা ৮২ সালে আমার মন ঘুরিয়ে দিয়েছিল, সেই নাতি বা নাতনির মুখ এবার আমি দেখব !

কিন্তু সুখ আমার কপালে সইবেনা — এইরকম বিবিলিপি নিয়েই বোধ হয় জন্মেছি। আর্থ্রাইটিসের ব্যথাটা বেশ শক্ত কামড়েই ধরেছে কোমর, হাঁটু এবং গোড়ালি। সেই যে ৮২ সালে বোন স্ক্যানের পর মাদু বলেছিল, 'বুবু, একটুখানি যেন আর্থ্রাইটিসের মতো দেখা যায়। তবে ও নিয়ে ভাববেননা।'

এই পাঁচ বছর ভাবিনি। কিন্তু এখন যে ভাবতে হচ্ছে। আর্থ্রাইটিস এতদিনে গা মোড়ামুড়ি করে জানান দিয়েছে বলে। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে, শুভানুধ্যায়ীদের কথা বিশ্বাস করে খাটো চুলের 'সৌন্দর্য', এবং 'ব্যক্তিত্বকে মেনে নিয়েছি। স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভাল আছে, হাতে পিষে নরম করে হলেও সব কিছুই গিলে খেতে পারি, এমনকি কারো বিয়ের ভোজের বিরিয়ানী কোর্মা-রেজালা পর্যন্ত। স্বাদও মোটামুটি পাই। চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য আছে, গাড়িও, আগের মতো দাবড়ে বেড়াতে না পারলেও মোটামুটি চালাই।

কিন্তু আর্থ্রাইটিস আমার জীবনটা আবার নতুন ক'রে নষ্ট করে দিতে উদ্যত। ব্যথার চোটে না পারি হাঁটতে, না পারি ঝুঁকতে, না পারি কোন কাজ। বসে বসে খেতে খেতে একবছরের মধ্যে ওজন বেড়ে ডবল হয়ে গেলাম। সে আরেক বিড়ম্বনা। বেশ পাতলার ওপর ছিলাম, ফিগারের প্রশংসা শুনতে পেতাম, তাতে অশান্ত মনে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ত, এবার সেটাও গেল। সব ব্লাউজ বদলাতে হল। আর ক্ষিদেও যেন রাক্ষুসে। আঙুলে পিষে নরম করে গিলে খাই বলেই কিনা জানি না, খাওয়ামাত্রই হজম হয়ে যায়। আর পেট খালি হলেই মাথা ধরে যায়, মেজাজ খারাপ হতে থাকে, মনঃসংযোগ নষ্ট হয়। অতএব আবার খাও। এতেও ওজন বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিকারের কোন উপায় নেই। এই বয়সে অন্য লোকে বদহজমে ভোগে, চুয়ো ঢেকুরে অতিষ্ঠ হয়। আর আমার বেলায় কিনা উল্টো। পোলাও, কোর্মা, বিরিয়ানী রেজালা সবই হজম হয়ে যায়। আত্মীয় বন্ধু সবাই বলে এতো তোমার সৌভাগ্য। হ্যাঃ। সৌভাগের নিকুচি করেছে।

নাতনি হবার আনন্দটা পুরো উপভোগ করতে পারলাম না আর্থ্রাইটিসের কারণে। নাতনিকে পাঁচ সপ্তাহের রেখে ঢাকা ফিরলাম। মনের দুঃখকষ্ট মনেই চেপে রেখে সংসারের কাজকর্ম, এবং লেখালেখিতে মন দেবার চেষ্টা করি। ঢাকা ফিরলেই হাজারটা সমস্যা হাজার হাত বাড়িয়ে আমাকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। আয়কর, পৌরকর এসব দেবার ঝামেলা, গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নেওয়া, রোড ট্যাক্স দেওয়া – সবই আমার নিজেই করতে হয়। প্রতিবছর এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। গাড়ি নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করতে খুব একটা খারাপ লাগেনা, সময় কেটে যায়। এবার আর্থ্রাইটিসের ব্যথার জন্য গাড়ি চালাতেও কষ্ট। আগে শাখারী পট্টির মতো সরু গলিতেও একা গাড়ি চালিয়ে যাওয়া আসা করেছি। কোন অসুবিধে বোধ করিনি। এখন ভীড়াক্রান্ত বড় রাস্তাতেও যেন কষ্ট হয়।

শরীর ক্রমাগত কাবু হয়ে যাচ্ছে। বয়সের ভারে যখন আপনা আপনি কাবু হয়, সেটা মানুষ সহ্য করে নিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ যখন কালান্তক ব্যাধির তীব্র থাবায় বয়সের ভার দশ-বিশ বছর আগেই ঘাড়ে এসে চেপে বসে, তখন আর সহ্য করা যায় না।

কিন্তু আমার চারপাশে যারা আছে, তারা আমার এই ভেতরের কষ্ট, হতাশা, মুহ্যমান অবস্থাটা টের পায় না। তারা বলে, আহা, কি শক্তি! কি সাহস! কি ধৈর্য। ওরা আমার

ভেতরের রক্তক্ষরণটা দেখতে পায় না। কিংবা হয়তো পায়, আমার সামনে প্রকাশ করেনা, পাছে আমি আরো ভেঙে পড়ি।

তাই আমি ভেতরে ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়লেও বাইরে মাথা উঁচু করে চলি, সংসারের যাবতীয় ঝঞ্ঝাটের সুরাহা করি, লেখালেখি চালিয়ে যাই। প্রতি বই মেলাতেই একটা দুটো ক'রে বই বের হচ্ছে। সেটাই যা সান্ত্বনা। অন্য সব কার্যক্রম যখন বাধ্যতামূলক ভাবে বন্ধ রাখতে হচ্ছে, তখন লেখালেখিটাই যা চালানো যাচ্ছে। সেটাই বা কম কি? নাকের বদলে নরুণ পেলাম, টাকডুমাডুমডুম। কিন্তু স্বস্তি আমার কপালে নেই। যখনি একটা দুঃখকে সইয়ে সইয়ে কোনমতে ধাতস্থ হই, তখনি আরেকটা নতুন দুঃখ এসে আমাকে তছনছ করে দেয়। নইলে ৮৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর কাজী হাসান হাবিব মাত্র ৪১ বছর বয়সে মারা যাবে কেন ? তাও ক্যান্সারে।

হাবিবের সঙ্গে আমার অনেক আগে থেকে পরিচয় ছিলনা। শাহরিয়ার কবিরের বন্ধু ছিল সে। তার নামও জানতাম না। ৮৫ সালের বইমেলায় আমার ছোটবেলার স্মৃতিকথা অন্যজীবন বেরোবে শাহরিয়ারের ডানা-প্রকাশনী থেকে। তখনই প্রথম শুনলাম হাবিবের নাম। সে প্রচ্ছদ করবে আমার বইয়ের। তখনো ভালো করে আলাপ পরিচয় হয়নি আমার সঙ্গে কেবল দেখা হয়েছে এবং দুচারটে কথা হয়েছে। সম্পর্কটা এইরকম থাকলেই খুশি হতাম। কিন্তু আমার কপাল মন্দ। হাবিবই তা থাকতে দিল না।

'একাত্তরের দিনগুলির' একটা কিশোর সংস্করণ লিখেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' বেবী মওদুদ সেই পাণ্ডুলিপি প'ড়ে বলে, এ বই আমরা বের করব। হাবিব এর প্রচ্ছদ করবে। আমি হাবিবকে নিয়ে আসব আপনার কাছে।

তিনচারদিন পরেই হাবিব এল বেবী মওদুদের সঙ্গে। দুই চোখে গভীর আগ্রহ নিয়ে বলল, আম্মা, লেখাটা আমি পড়েছি। ছোটদের জন্য দারুণ বই হবে। আমি পাতায় পাতায় ছবি আঁকব। চার রঙা প্রচ্ছদ দেব। মনের মতো করে বের করব বইটা। দেখবেন।'

হাবিবের এ সাধ পূর্ণ হতে পারেনি। তার আগেই মরণ ব্যাধি ক্যান্সার তাকে আক্রমন করেছে। ভাবি, কেন এই অবেলায় ওর সাথে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হল, কেন ও আম্মা বলে ডাকল ? কেন এত মায়ায় জড়াল ?

হাবিবের ক্যান্সার যখন ধরা পড়ল, তখনই তাকে জানানো হয়নি। কে তাকে এই মর্মান্তিক খবরটা বলবে ? শাহরিয়ার বলল, আম্মা আপনি হাবিবকে বলবেন এ কথাটা।

আমি কুঁকড়ে গিয়ে বললাম, 'অসম্ভব। আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'

শাহরিয়ার শান্ত কণ্ঠে বলল, আম্মা, আপনি ছাড়া আর কার এত সাহস আছে যে ওকে মুখফুটে এই সাংঘাতিক কথাটা বলবে ? আপনি ছয় বছর ধরে লড়াই করে দুদুটো বড় অপারেশানের পরও বেঁচে আছেন, আপনার মুখ থেকে শুনলে তবেই তো সেও মৃত্যুর সঙ্গে লড়বার সাহস পাবে।'

শাহরিয়ার আমাকে ভাবে কি ? আমি কি পাষাণে তৈরী মূর্তি? আমার কি ব্যথা বেদনা আর্তি-হাহাকার থাকতে নেই ? নিজে কষ্টে বাঁচিনা, তার ওপর আবার এই নতুন মায়ায় জড়িয়ে আরো কষ্ট পাওয়া।

হাসান হাবিব তো বাঁচল না। আমার যেমন প্রথম স্টেজেই ক্যান্সার ধরা পড়েছিল তার বেলা তেমন হয়নি। ধরা পড়তে দেরি হয়েছিল, চিকিৎসাও সঠিক পথে চলেনি। সে মারা গেল কিন্তু আমাকে নতুন করে একটা ব্যথার ঝাপটা দিয়ে গেল।

মুস্তাফিজুর রহমান আমার বইয়ের অনুবাদ শেষ করে ফেলেছে ন'মাসের মধ্যেই। আমি আমেরিকায় থাকা কালেই মহিউদ্দিন এবং মুস্তাফিজ দুজনে মিলে প্রকাশকও পেয়ে গেছে। দিল্লীর স্টার্লিং পাবলিশার্স এবং ঢাকার একাডেমিক পাবলিশার্স উভয়ের যৌথ প্রযোজনায় বের হবে বইটা। ইংরেজি নাম ঠিক হয়েছে Of Blood and Fire.

মনে কিছুটা শান্তি। একাত্তরের দিনগুলি বাংলাভাষাভাষী পাঠকের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর মধ্যে সাতটা সংস্করণ বের হয়ে গেছে। অনেকেই বলাবলি করে, এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ হওয়া উচিত। বহির্বিশ্বের পাঠকের জানা দরকার আসলেই এদেশে কি ঘটেছিল একাত্তরে। আরো বেশি করে জানা দরকার পাকিস্তানের পাঠকদের।

৮৯ সালের শেষ দিকে দিল্লী থেকে বইটি প্রকাশিত হ'ল। আর ঢাকা সংস্করণ বের হল ৯০ সালের বই মেলায়, আমার আরো পাঁচটি বাংলা বইয়ের সাথে।

এখন আমি ২০০০ সালের দিকে তাকিয়ে আছি। অতদিন বাঁচব কি? এখন আমি বাঁচতে চাই। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য আরো লিখে যেতে চাই। আমার বই পড়ে যে সব পাঠক আমার কাছে আসে, তাদের বেশির ভাগের বয়স ১৫ থেকে ২৫-য়ের মধ্যে। তারা আমার কাছ থেকে জগত ও জীবন সম্বন্ধে কতো কিছু জানতে চায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা আরো বেশি করে জানতে চায় ; তাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ মেশানো নানা সমস্যার সমাধানও জানতে চায়। তারা আমাকে ঘিরে রাখে। তাদের জন্যই আমি এই বৃদ্ধ বয়সে একাকী বাস করেও কখনো নিঃসঙ্গ বোধ করি না।

তাদের আগ্রহে জ্বলজ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আরো বাঁচার, আরো লিখে যাবার প্রেরণা পাই।

— ডিসেম্বর, ১৯৯০